PRINCIPLES OF HYGIENE

OR

PRESERVATION OF HEALTH

IN

BENGALI

BY

RADHIKA PRASANNA MUKHERJI.

Thirty-ninth Edition.

স্বাস্থ্য-রক্ষা

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

ঊনচত্বারিংশ সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত)

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,

HARE PRESS:

46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

20, CORNWALLIS STREET.

[illegible].

No. 1927

From

THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION.

To

THE SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL,

General Department.

Dated, FORT WILLIAM, *May* 22, 1871

SIR,

WITH reference to your No. 1191, dated 24th April, forwarding for report a Bengali work called "How to preserve Health" published by Babu Raj Krishna Chacraburti, a medical practitioner of Janai, I have the honor to state that another treatise on the same subject entitled "Preservation of Health" by Babu Radhica Prosunno Mookerjee, now in its 8th edition, has been one of the subjects in the course for the Vernacular and Minor Scholarship Examinations and that from the opinion of Dr. Chakraburti, hereto annexed, it appears that the book now in use is altogether a better book than the new treatise. I do not, therefore, think it advisable to adopt the new book in supersession of the old one.

The original enclosures are returned as requested.

I have &c.,

(Sd.) W. S. ATKINSON,

Director of Public Instruction.

11, CHOWRINGHI ROAD,

May 18, 1871.

MY DEAR SIR,

I HAVE carefully gone over the two Vernacular books on the Preservation of Health, which you did me the honour to ask my opinion on. Radhica Prosunno Mookerjee's work is certainly better, and more complete than that of Raj Kisto Chacraburti The latter is chiefly based on the report of the Sanitary Commissioner for Bengal, and devoted to a consideration of the causes of Epidemics (or rather the Bengal Epidemics). It would be useful to have a copy of it in each School Library, but it cannot supersede Radhika's book which has a larger scope, is more elaborate and elegant, and is better printed.

Yours very truly,

(Sd.) S. G. CHUCKERBURTTY, M. D.

The books in question are herewith returned.

৩৭শ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় স্বাস্থ্যবিদ্যাবিষয়ক কোন গ্রন্থ না থাকায় ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মৃত মহাত্মা এইচ উড্রো সাহেব উক্ত বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহারই অনুমতি ও পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক এই পুস্তক রচনা করিয়া ১৮৬৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি। প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে পুস্তকের আকার ৬০ পৃষ্ঠার কিছু অধিক ছিল ও ইহাতে চিত্রাদি কিছুই ছিল না।

এই পুস্তক প্রকাশের পর হইতে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়-দিগের অনুমতিক্রমে ইহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার অন্যতম বিষয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ অব্দে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল মহোদয় রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার অনুরোধে স্বাস্থ্যবিদ্যাকে স্থানভ্রষ্ট করেন, কিন্তু ১৮৭৭ অব্দ হইতে পুনরায় ইহার প্রতি কিয়ৎ-পরিমাণে সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত লক্ষিত হয়। ১৮৮১ অব্দ হইতে বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহামান্য স্যর এশ্‌লি ইডেন বাহাদুরের এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যর এ ক্রফ্‌ট মহোদয়ের আদেশ অনুসারে স্বাস্থ্যবিদ্যা মধ্যশ্রেণী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার একটী অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমার পরমবন্ধু শ্রীরামপুরের সুযোগ্য সিবিল মেডিকেল আফিসার শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় সপ্তদশ সংস্করণকালে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থখানির উৎকর্ষ সাধন এবং ইহাকে মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৪ অব্দের জুন মাসে উদয়চাঁদ বাবু (১৮৩৪-৮৪) হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইহার প্রণীত প্রাচীন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে নূতন গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া দেশের কত উপকার করিতে পারিতেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণকালে পুস্তকে কতিপয় অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত এবং পাঠকদিগের সুবিধার জন্য পুস্তকের শেষে আদর্শপ্রশ্নাবলী দেওয়া হইয়াছিল। এবার পুস্তকের উৎকর্ষ সাধন জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। ইতি ১৫ই জুন ১৮৯৫।

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন শর্ম্মণঃ

নির্ঘণ্ট পত্র।

উপক্রমণিকা।

রোগ উৎপত্তি ও নিবারণ	১
রসায়ন সূত্র	৪

প্রথম অধ্যায়।

শারীরিক ক্রিয়া।

শরীর পোষণ	১১
নরদেহ	১২
অঙ্গসঞ্চালন	১৪
ত্বক্	১৫
পাক যন্ত্র। পরিপাক ক্রিয়া ...	১৮
হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র	২১
রক্ত-সঞ্চালন	২৬
শ্বাসকার্য্য	২৭
যকৃৎ ও প্লীহা	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খাদ্য।

খাদ্যের আদর্শ	২৯
ক্ষুধা	[illegible]
পরিমিতাহার	৩৩
খাদ্যের পরিমাণ	৩৫
আহার কালে পরিশ্রম	৩৭
মজ্জন ও ভোজন	৩৭
পরিপাক কাল	৩৯
মাংস ভোজন	৪০
মৎস্য	৪১
ডিম্ব	৪২
দুগ্ধ	৪২
গোদুগ্ধ পরীক্ষা	[illegible]
দধি প্রভৃতি ...	[illegible]

তণ্ডুল, গোধূম ইত্যাদি ... ৪৫
গম ... ৪৬
যব ... ৪৬
ভুট্টা ... ৪৭
ডাল ... ৪৮
তরকারী ... ৪৮
অম্ল ... ৪৯
মিষ্টান্নাদি ... ৪৯
ফলমূল ... ৫০
স্থলবিশেষে পথ্য ... ৫১
পাত্রাদি পরিষ্করণ ... ৫২

তৃতীয় অধ্যায়।

পানীয় জল।

জলের প্রয়োজনীয়তা ... ৫৩
পিপাসা ... ৫৪
বিশুদ্ধজল সংগ্রহ ... ৫৫
নদীর জল ... ৫৬
পুষ্করিণীর জল ... ৫৯
কূপের জল ... ৬১
দূষিত জল ... ৬৩
কলিকাতায় জলের কল ... ৬৪
জল বিশোধন ... ৬৬
জল পরীক্ষা ... ৬৮
চা ও কাফী প্রভৃতি পানীয় ... ৬৯
সুরা ... ৭০
অন্যান্য মাদক দ্রব্য ... ৭১

চতুর্থ অধ্যায়।

বায়ু।

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা ... ৭২
দূষিত বায়ু ... ৭৩
বায়ু বিশোধন ... ৭৭
শুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন ... ৭৮
বায়ু সেবন ... ৮০

পঞ্চম অধ্যায়।

ত্বক্, পরিচ্ছন্নতা ও পরিধেয়।

ত্বকের কার্য্য	৮১
স্নান	৮৩
মলিনতা	৮৭
পরিধেয়	৮৮
বস্ত্রের প্রয়োজন	৮৮
কার্পাস সূত্রের বস্ত্র	৮৯
ছালটী কাপড়	৯০
পশমী কাপড়	৯০
পশুচর্ম্ম বস্ত্র	৯১
রবরের কাপড়	৯১
রেশমের কাপড়	৯১
সাধারণ	৯১

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাসগৃহ।

উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ	৯২
জানালা দ্বার	৯৪
জল নিকাশের উপায়	৯৬
গৃহ শুষ্ক রাখিবার উপায়	৯৮
গোশালা ও পশুশালা	৯৮
বাসস্থান পরিষ্করণ	৯৯
সূতিকাগৃহ	১০০

সপ্তম অধ্যায়।

গ্রাম-সংস্করণ।

স্বাস্থ্যের অন্তরায়	১০১
গ্রাম-সংস্করণের নিয়মাবলী	১০৩
কলিকাতা নগর সংস্করণ প্রণালী...	১০৬

অষ্টম অধ্যায়।

রোগনিবারণ।

ম্যালেরিয়া জ্বর	১০৮
ওলাউঠা বা বিসূচিকা	১১৬
বসন্ত	১২০
পানিবসন্ত ... ... — ..	১২৫
হাম	১২৬

নবম অধ্যায়।

শারীরিক ও মানসিক শ্রম, নিদ্রা, বিশ্রাম ও মনোবৃত্তি।

শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম	১২৭
নানাবিধ ব্যায়াম	১৩০
মানসিক শ্রম	১৩২
নিদ্রা	১৩৫
বিশ্রাম	১৩৮
মনোবৃত্তি	১৪১

দশম অধ্যায়।

বিবাহ	১৪২
বাল্যবিবাহ	১৪৩
অন্যান্য নিয়ম	১৪৪

একাদশ অধ্যায়।

জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ	১৪৪
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান চর্চ্চার ফল	১৪৫

পরিশিষ্ট।

প্রশ্নাবলী	১৪৭

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

রোগ উৎপত্তি ও নিবারণ। আমাদের দেশ জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি ভয়ানক রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কতশত গ্রাম এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও নানা স্থান জ্বররোগের আতিশয্যবশতঃ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি কি কারণে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ও কি উপায়েই বা তাহাদের প্রতিবিধান হয় তদ্বিষয়ে অনেকেই ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। অত্যাচার করিলে যে আমাদিগকে রোগগ্রস্ত ও পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, ইহা অনেকেই বুঝেন না; কেহ কেহ বা অল্প পরিমাণে বুঝিয়াও অভ্যাস ও অবস্থাদোষে সাবধান থাকিতে পারেন না। অনেকে এরূপ বিবেচনা করেন, আমরা ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়াছি বলিয়া এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; কেহ কেহ ভাবেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়াও চিরদিন সচ্ছন্দ শরীরে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা কেন নিয়মাধীন হইব? এরূপ ভাবা ভ্রমের বিষয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতিভোজন, দূষিত বায়ু সেবন, দূষিত জল বা সুরা পান, অপরিষ্কৃত, আর্দ্র ও জনাকীর্ণ স্থানে বাস, অপরিষ্কৃত বস্ত্র ব্যবহার, অনিয়মে ভোজন, পরিশ্রমাভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিশয় শীত বা রৌদ্র ভোগ, প্রভৃতি অত্যাচার করিলে শরীরে কোন না কোন প্রকার

অসুখ হইবেই হইবে; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড কখনই অন্যথা হইবার নহে। স্বভাবতঃ সুস্থ ও দৃঢ়কায় ব্যক্তি যে মারীভয়াক্রান্ত স্থানে অল্পক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিয়া অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলতঃ ইতিপূর্ব্বে যে সকল স্থান স্বাস্থ্যকর ছিল, এক্ষণে নানা কারণে সেগুলি রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিকার্য্যের বিস্তার বশতঃ অনেকে গ্রামের অভ্যন্তরে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, এবং অল্প স্থানে অধিক লোক বাস করাতে গ্রাম আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কৃত থাকিতেছে না। কত প্রাচীন পুষ্করিণীর জল দূষিত ও অপরিষ্কৃত হইয়াছে। পশুচারণের যথেষ্ট ভূমি না থাকায় দুগ্ধাদি আর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অনেকে রোগগ্রস্ত হইতেছে। কত নদী ও খাল শুষ্ক ও স্থানে স্থানে ভরাট হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা রেলরোড ও নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইবার পর হইতে বর্ষার জল নির্গমের প্রশস্ত প্রণালীর অভাব হইয়াছে। এজন্য আর বর্ষার জল ভালরূপে নির্গত হয় না; সুতরাং নিকটবর্ত্তী ভূভাগ আর্দ্র থাকিয়া পীড়া উৎপাদন করে।

স্বাস্থ্য অতি অমূল্য ধন। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধনজনযৌবন, বুদ্ধিবিদ্যাখ্যাতি কিছুতেই সুখ হয় না। পীড়া হইলে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায় না, কিন্তু ঔষধ পথ্য প্রভৃতির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। যদি পীড়ার পরিণাম স্বাস্থ্যলাভ না হইয়া মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কতই ক্লেশ, শোক ও দুঃখ।

পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই পুস্তকের লিখিত নিয়মাদি পালন করিলেই সর্ব্বপ্রকার রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন; কারণ কোন কোন রোগ অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা পিতা মাতা হইতে শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হই ; সুতরাং তাঁহাদের যে যে রোগ থাকে, তাহা সময় বিশেষে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। ক্ষয়কাশ বা উন্মাদ রোগ পুরুষানুক্রমে এক বংশে দেখা গিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রোগবিশেষের বীজ বায়ু-সহকারে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সময়ক্রমে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। সহসা বৃষ্টি, ঝটিকা, বজ্রপাত বা সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে আমাদিগের শরীরে রোগ জন্মে। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীত বা বর্ষাকালে কোন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বয়ঃক্রম ভেদে কোন কোন রোগের আধিক্য হয়। নিতান্ত শৈশবাবস্থায় শীতল বায়ু লাগিয়া ক্ষুদ্র শিশু দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হয়। বসন্ত, হাম, পাণিবসন্ত প্রভৃতি রোগ সংক্রামক হইলে উহাতে অনেকে আক্রান্ত হয়। যৌবনের প্রারম্ভে কেহ কেহ কাশ, কেহ বা অবিরাম জ্বর, কেহ বা বাত রোগে আক্রান্ত হয়। পূর্ণবয়স্কদিগের মধ্যে অনেকে পুরাতন ব্যাধি বিশেষে কষ্ট পাইয়া থাকেন। কাশ, হৃৎপিণ্ডের রোগ, অজীর্ণদোষ, বাতের বেদনা, যকৃৎ ও মূত্র-যন্ত্রের রোগ প্রভৃতি এই সময়ে ক্লেশকর হয়। কেহ কেহ বা অর্দ্ধাঙ্গ বা মূর্চ্ছারোগে সহসা মানবলীলা সংবরণ করেন। বহুমূত্র রোগও এই সময়ে দেখা যায়। বৃদ্ধকালেও ইহার মধ্যে কোন না কোনটী প্রবল হইয়া রোগীকে সহসা মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে। স্ত্রী জাতি অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে মৃতের সংখ্যা অধিক। লণ্ডন নগরে জীবনের প্রথম বর্ষ অতীত না হইতে হইতে সহস্র বালকের মধ্যে ৮৭ ও সহস্র বালিকার মধ্যে ৭৬ জন গতায়ু হয়। ২০ হইতে ২৫ বর্ষের ১০০০ পুরুষের মধ্যে আট জন ও ১০০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছয় জন মরে। কখন্ কোন্ রোগের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে জানা

যায় না ; কিন্তু কতকগুলি সাধারণ বা বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে যে সচরাচর সুস্থ শরীরে থাকা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রসায়ন সূত্র। যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের সুবিধার জন্য মূল বা রূঢ় পদার্থের সংযোগবিয়োগাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে লেখা হইল। এইটি পাঠ করিলে পুস্তকের কোন কোন অংশ অনায়াসে বুঝা যাইবে।

আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই নানাবিধ পদার্থের যোগে উৎপন্ন। সহসা লোকে মনে করেন যে, একখণ্ড কাষ্ঠ একমাত্র পদার্থময় কিন্তু বাস্তবিক উহা কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত। ঐ গুলির মধ্যে কোন কোনটী পৃথক্ করা যায় বটে, কিন্তু সকল গুলি পৃথক করা আমাদের অসাধ্য। মৃত্তিকা, প্রস্তর, বালুকা প্রভৃতিও যৌগিক পদার্থ এবং উহাদের প্রত্যেক উপাদান নির্ণয় করাও সহজ নহে। রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন যৌগিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া যখন দেখা যায় যে, ঐ গুলির মধ্যে কোনটী আর যৌগিকভাবাপন্ন নাই, তখন মনে করা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটী রূঢ় পদার্থ হইবে। ভূমণ্ডলে সহস্র সহস্র জাতীয় যৌগিক পদার্থ আছে। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, উহারা কতিপয় রূঢ় পদার্থের সমষ্টি মাত্র। এই গুলির সংখ্যা ৬০ হইতে ৭০ হইবে, কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেকগুলি এত বিরল যে, তাহাদের প্রকৃতি না জানিলেও রসায়ন শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞানলাভ করা যায়। বাস্তবিক ১০।১২টী রূঢ় পদার্থের যোগে জগতের অধিকাংশ দ্রব্য নির্ম্মিত। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, (১) রূঢ় পদার্থ হইতে অন্য

জাতীয় পদার্থ বাহির করা যায় না, ও (২) যৌগিক পদার্থ দুই বা ততোধিক রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন এবং ঐ গুলি প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা স্বতন্ত্র করা যায়।

পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর যোগে উৎপন্ন। পরমাণুর আয়তন অতিশয় সূক্ষ্ম। মনুষ্যেরা একাল পর্য্যন্ত কোন বস্তুকে যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করুন না কেন, তাহার আদি পরমাণু প্রাপ্ত হন নাই। পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন ভাববিশিষ্ট, এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থে আছে।

রূঢ় পদার্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটিকে অধাতব ও অবশিষ্টগুলিকে ধাতব পদার্থ বলা যায়।

বাঙ্গালা নাম।	ইংরাজি নাম।
১ অম্লজনক	অক্সিজেন
২ উদজনক	হাইড্রোজেন
৩ যবক্ষারজনক	নাইট্রোজেন
৪ গন্ধক	সল্ফর
৫ উপগন্ধক	সিলিনিয়ম্
৬ অনুপগন্ধক	টেলুরিয়ম্
৭ হরিতক	ক্লোরাইন
৮ পূতিক	ব্রোমাইন
৯ অরুণক	আইওডাইন
১০ কাচান্তক	ফ্লোরাইন
১১ প্রস্ফুরক	ফস্ফরস্
১২ টঙ্গক	বোরন্
১৩ সৈকতক	সিলিকন্
১৪ অঙ্গার বা অঙ্গারক	কার্ব্বন
১৫ শেঁকো	আর্সেনিক

বিশুদ্ধ ধাতুমাত্রই মূল পদার্থ; আমাদের দেশে তাহার মধ্যে কয়েকটী মাত্র ব্যবহৃত হয় যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, রাঙ, সীস, দস্তা ইত্যাদি। ধাতু সমূহের রাসায়নিক কার্য্য এ পুস্তকে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; কতিপয় অধাতব পদার্থের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

অধাতব পদার্থের মধ্যে অম্লজনক, উদজনক, যবক্ষারজনক ও অঙ্গারক প্রাকৃতিক অনেক কার্য্যে লাগে। এজন্য উহাদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হইবে। যে মূল পদার্থগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের পরমাণু সকল বিশেষ বিশেষ পরিমাণে মিলিত হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছে। দুই বা ততোধিক জাতীয় পরমাণু রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হইলে, তাহাদের পূর্ব্ব প্রকৃতি থাকে না, তখন নূতন গুণবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠে। গন্ধক ও পারদের রাসায়নিক সংযোগ হইলে হিঙ্গুল প্রস্তুত হয়। হিঙ্গুল তখন একটী নূতন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। অম্লজনক ও উদজনক বায়ুর সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। অন্যান্য পদার্থেরও এইরূপ ঘটে।

মূল পদার্থের মধ্যে অম্লজনক, উদজনক, যবক্ষারজনক প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ অসংযুক্ত অবস্থায় বায়বীয় আকারে থাকে। উপায়-বিশেষ দ্বারা অম্লজনক ও উদজনককে তরল অবস্থায় আনা হইয়াছে। এ দেশে পারদ প্রভৃতি সচরাচর তরল অবস্থায় থাকে, তাপ সংযোগ করিলেই বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং শীতল পদার্থ সংযোগে কঠিন হইয়া উঠে। কয়েকটী পদার্থ সচরাচর কঠিন অবস্থাতেই থাকে, যেমন গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য। উহাদিগকে তাপসংযোগদ্বারা তরল ও বাষ্পীয় অবস্থায় আনা যাইতে পারে।

অম্লজনক বায়ু সংযোগে ভূপৃষ্ঠস্থ অধিকাংশ রাসায়নিক কার্য্য

সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পদার্থটী অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বায়ু রাশির আয়তনের ১/৫, জল রাশির ভারের ৮/৯ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ প্রস্তরাবলীর ভারের ১/৩ হইতে প্রায় অর্দ্ধাংশ অম্লজনক। অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেই অম্লজনক আছে বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা উহার নাম অম্লজনক রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে, এই বায়ু সংযোগ না হইলে অম্লরস উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, অম্লজনক ব্যতীত লবণদ্রাবকাদি তীব্র অম্লরস বিশিষ্টকতিপয় দ্রাবক প্রস্তুত হয়, বরং উদজনকের অংশ না থাকিলে কোন অম্লরস দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না।

উদজনক বাষ্প অম্লজনকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নহে। জলরাশির ভারের ১/৯ অংশ উদজনক। উহা ব্যতীত জল উৎপন্ন হয় না বলিয়া উহার নাম উদজনক হইয়াছে। জল ভিন্ন অন্য পদার্থেও উদজনক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ ও জন্তুগণের শরীরে উহা বিদ্যমান আছে।

যবক্ষারজনক প্রধানতঃ বায়ুরাশিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, বায়ুরাশির আয়তনের প্রায় ৪/৫ অংশ এই বাষ্প। এতদ্ভিন্ন এমোনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থে, এবং অনেক উদ্ভিজ্জে ও জন্তুগণের শরীরে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবক্ষারে এই পদার্থ আছে বলিয়া উহার নাম যবক্ষারজনক হইয়াছে।

অঙ্গার কঠিন পদার্থ। আমরা সচরাচর কাষ্ঠখণ্ডদাহন করিয়াই অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন পাথরিয়া কয়লাও এক প্রকার অঙ্গার। পশুদিগের অস্থি দাহন করিয়াও অঙ্গার প্রস্তুত করা যায়। এই সকল প্রকার অঙ্গারেই নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। হীরক এবং কৃষ্ণসীস বিশুদ্ধ অঙ্গারের উদাহরণ স্থল।

যে স্থলে বায়ুর সমাগম আছে, তথায় অঙ্গার দাহন করিলে অম্লজনক বায়ুর যোগে উহা হইতে দ্বাম্ল-অঙ্গারক বায়ু প্রস্তুত হয়। উহাতে দুইভাগ অম্লজনক ও একভাগ অঙ্গার থাকে। জন্তুগণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাতে যে অঙ্গারক বায়ু থাকে, তাহা বাহ্য বায়ুতে মিশ্রিত হয়। উদ্ভিদগণ আবার বায়ুস্থ অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গারের ভাগ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অম্লজনক অংশ পরিত্যাগ করে। এই দুই কার্য্যবশতঃ বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারক বায়ুর ভাগ সর্ব্বদা সমান থাকিয়া যায়।

বিশুদ্ধ বায়ুর আয়তন একশত ধরিলে উহাতে প্রায় ৭৯ ভাগ যবক্ষারজনক ও ২১ ভাগ অম্লজনক বায়ু আছে। এতদ্ভিন্ন অল্পপরিমাণে দ্বাম্লঅঙ্গারক বায়ুও উহাতে মিশ্রিত আছে। ৫০০০ পাঁচ হাজার ভাগ বায়ুতে প্রায় দুইভাগ এই বায়ু। এমোনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী বায়ুও বায়ুরাশিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উহাদের পরিমাণ এত অল্প যে অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা কঠিন। এমোনিয়া তিনভাগ উদজনক ও একভাগ যবক্ষারজনকের মিলনে উৎপন্ন। জলীয় বাষ্প, ধূলা প্রভৃতি অনেক সময় বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে।

বিশুদ্ধ জল ও জলীয় বাষ্প, উদজনক ও অম্লজনকের সংযোগে উৎপন্ন। নয় সের জলে আট সের অম্লজনক ও এক সের উদজনক বিদ্যমান থাকে।

অম্লজনকের সহিত নিয়তই অনেক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইতেছে। অঙ্গার, উদজনক ও যবক্ষারজনক যে কোন পদার্থে থাকুক না কেন, অম্লজনকের সহিত উহাদের এরূপ সম্বন্ধ যে অবস্থাবিশেষে তাহার সংযোগ হইবামাত্র উহারা রূপান্তর ধারণ করে। উদ্ভিদ্ ও জীবশরীর নিয়তই অম্লজনক যোগে পরিবর্ত্তনশীল রহিয়াছে। জীব ও উদ্ভিদের জীবন শেষ

হইলে, তাহার যে অংশ বায়ুস্থিত অম্লজনকের সংসর্গে আইসে, সেই অংশের উদজনক, বায়ুস্থ অম্লজনকের যোগে জলরূপে পরিণত হয়, এবং অঙ্গারের ভাগ অম্লজনক যোগে দ্ব্যম্লঅঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়। এই সকল প্রক্রিয়া কালে শরীরের কিয়দংশের যবক্ষারজনক ও উদজনক একত্র যোগে এমোনিয়া রূপ ধারণ করতঃ বায়ুতে মিলিত হয়। অস্থি প্রভৃতি কঠিন অংশ ক্রমে ক্রমে চূর্ণ ও রূপান্তরিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়।

কাষ্ঠদাহন কালেও ঐরূপ দেখা যায়। অম্লজনক যোগে কাষ্ঠস্থ অঙ্গারের ভাগ দ্ব্যম্লঅঙ্গারক বায়ু হইয়া উড়িয়া যায়। উদজনকের অংশ জলরূপে পরিণত হয় এবং অবশিষ্টাংশ ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

আমাদের চতুর্দ্দিকে অম্লজনকবায়ুযোগে নিরন্তর যে সকল রাসায়নিক কার্য্য হইতেছে, তৎসমুদায়ের দ্বারা তাপ উদ্ভাবন হইয়া থাকে। উদ্ভিদ ও জীবশরীর যখন পচিয়া যায় অর্থাৎ যৎকালে উহাদের উপর অম্লজনকবায়ুর কার্য্য অব্যাহতরূপে আরম্ভ হয়, তখন প্রতিনিয়ত অল্প অল্প করিয়া তাপ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যখন কোন জন্তু নিঃশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করে, তখন বায়ুস্থিত অম্লজনক শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে রাসায়নিক কার্য্য করিতে থাকে। সুতরাং সেই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেও তাপ উদ্ভাবিত হয়।

বায়ুরাশিতে তাড়িতের সংযোগ হইলে অথবা অম্লজনকের সহিত প্রস্ফুরক সংযুক্ত হইলে অম্লজনকের কিয়দংশের রূপান্তর উপস্থিত হয়। ঈদৃশ ভাবান্তরিত অম্লজনককে গন্ধাম্লজনক বা "ওজোন" বলে। ইহার ভার অম্লজনকের দেড় গুণ। ওজোনের রাসায়নিক শক্তি অতি প্রবল; উহা অতি দ্রুতভাবে অধিকাংশ

বস্তুর উপর কার্য্যকারী হয়। গলিত জীবশরীরের পূতিগন্ধময় পদার্থ ইহার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেক চিকিৎসকের এইরূপ বিশ্বাস যে, বায়ুতে ওজোনের অভাব হইলে ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের আতিশয্য হয়। অতি দূষিত বায়ুতে ওজোন মিশ্রিত হইলে তাহার দোষ নিরাকৃত হয়। কখন কখন ফুস্‌ফুসের পীড়া সংক্রামকরূপে ব্যাপ্ত হইলে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বায়ুতে ওজোনের ভাগের আধিক্য হইয়াছে।

রৌদ্র দ্বারা জগতের অনেক কার্য্য সাধিত হয়। জীব ও উদ্ভিদ্‌গণ তৎপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহার শক্তিতে বায়ুর অনেক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কোন কোন রাসায়নিক কার্য্য রৌদ্রের সহকারে হইয়া থাকে। বাসগৃহে রৌদ্র সঞ্চারের উপায় না থাকিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। কিন্তু অধিক রৌদ্রভোগ করিলে নানাপ্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্ম জন্মান্তরের অনেক অদ্ভুত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা করিলে তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ঘটনা অনুভব করা যায়। শবদাহকালে যে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, সেইগুলি উদ্ভিজ্জবিশেষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদীয় অংশরূপে পরিণত হইতে পারে। সেই উদ্ভিদ আবার প্রাণিবিশেষের খাদ্য এবং উক্ত প্রাণীর মাংস মনুষ্যের উদরস্থ হইয়া তাহার শরীর পোষণ করাও অসম্ভব নহে। ফলতঃ আমাদের শরীর হইতে নিয়ত যে সকল পদার্থ বহির্গত হইতেছে, তাহার কতক অংশ আবার রূপান্তরিত হইয়া কখন না কখন খাদ্যরূপে আমাদের শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

প্রথম অধ্যায়

শারীরিক ক্রিয়া।

শরীর পোষণ। বায়ু, জল ও অন্ন আমাদের শরীর রক্ষার প্রধান সামগ্রী। নিঃশ্বাসগ্রহণ, জলপান ও আহার গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। কারণ কয়েক মিনিট নিঃশ্বাসগ্রহণ ও কয়েক দিন জলপান বা আহার গ্রহণে বিরত থাকিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জল, বায়ু ও অন্নের প্রয়োজন কি? কি নিমিত্তই বা আমরা এই তিনটী বিষয় ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারি না? ক্ষুধার কারণ কি, আহার দ্বারাই বা কিরূপে তাহার শান্তি হয়, এবং শান্তি না হইলে কি জন্যই শরীরক্ষয় ও মৃত্যু হইয়া থাকে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর ক্রমে এই পুস্তকে প্রদত্ত হইতেছে।

জীবগণের শরীর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস, স্বেদনির্গম প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জীবিত থাকি, হস্তপদ সঞ্চালন, চক্ষুরুন্মীলন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আমাদের অশেষবিধ সুখের কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির চালনা প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে আমরা অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকি, তৎসমুদায় দ্বারা শরীরের অংশবিশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আমরা পানভোজন দ্বারা এই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি।

যখন এইরূপ ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয়, তখন স্বতঃ ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আহার গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। ভুক্ত দ্রব্য কিছুকাল শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা রক্ত রূপে পরিণত হয়; সেই রক্ত দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিয়া যে অংশের যাহা ক্ষয় হইয়াছে তাহা পূরণ করিয়া দেয়। যদি আমরা আহার গ্রহণে বিরত থাকি কিম্বা অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করি, তাহা হইলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে ও পরে প্রাণবিয়োগ হয়।

নরদেহ। শরীর অস্থি, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে গঠিত। দেহের উপরের আবরণ চর্ম্ম। চর্ম্মের নীচে মাংস ও মাংসের নীচে অস্থি। অস্থি দ্বারা শরীরের অবয়ব সংস্থান ও গঠন সম্পন্ন হয়, অস্থিময়কঙ্কাল ও চর্ম্মের অভ্যন্তরে পাক যন্ত্র প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক যন্ত্র সকল অবস্থিত। অস্থি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় পদার্থ এবং এই অস্থির বলে আমরা ভারবহনে সমর্থ হই। আমাদের মধ্যেও যাহাদের অস্থি অপেক্ষাকৃত কোমল, তাহারা অধিক ভার বহনে অসমর্থ; দেখ শিশুরা অন্ত ভারের কথা দূরে থাকুক, আপন শরীরের ভারও বহন করিতে পারে না। ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারবহন করিতে গেলে অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। বোধ হয় তোমরা

অনেকেই মনুষ্য বা অন্য কোন বৃহৎকায় জীবের অস্থিময় কঙ্কাল দেখিয়া থাকিবে। এই কঙ্কাল বহুসংখ্যক অস্থিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। অস্থি সমূহের কতকগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও অবশিষ্ট-গুলি বন্ধনীদ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। নিম্নে মনুষ্যকঙ্কালের একটী প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।
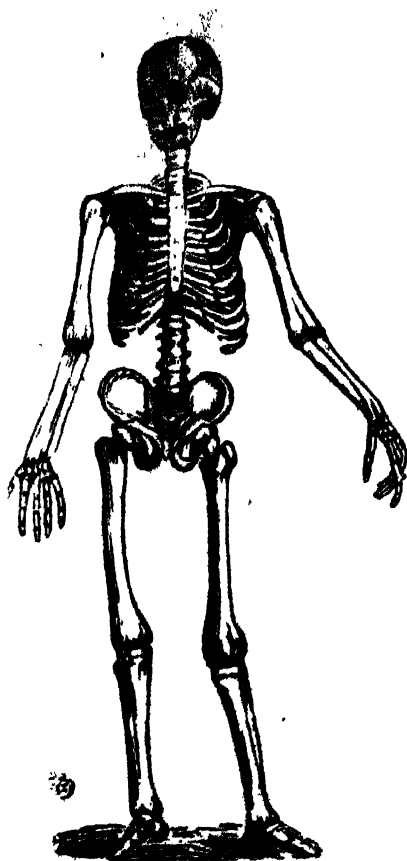
অস্থিময় জীবকঙ্কাল শুদ্ধ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে গমনাগমন প্রভৃতি কোন কার্য্যই হইতে পারিত না। অস্থি সকল কাহার বলে খেলিবে? এই অভাব মোচনের জন্য অস্থি সকলে মাংসপেশী সংলগ্ন রহিয়াছে। এই সমস্ত পেশী অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রধান সাধন। এক একটী পেশী নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমান্তরাল মাংসসূত্রের সমষ্টি। পেশী সমূহ আবশ্যক মতে সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই অঙ্গসঞ্চালন হইয়া থাকে।

পেশীগুলি অস্থিতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত। শরীরের গ্রন্থিস্থলে পেশীর দুই প্রান্ত দুই দিকের অস্থিতে সংলগ্ন। সঙ্কুচিত হইলে পেশীর আয়তন হ্রস্ব হয়, এই জন্যই তৎসংলগ্ন অস্থিগুলি খেলিয়া থাকে।

সঞ্চালনকালে পরস্পরের ঘর্ষণে সন্নিহিত অস্থিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ অস্থির যোড়ের মুখ অপেক্ষাকৃত কোমল পদার্থে আবৃত। এই কোমল পদার্থকে উপাস্থি বলা যাইতে পারে। উপাস্থির গায়ে এক প্রকার তৈল-ময় পদার্থ থাকে। যেমন গাড়ীর চাকায় তৈল দিলে তাহার আলের সহিত ঘর্ষণ সহজে সম্পন্ন হয়, সেইরূপ উপাস্থি সকলে তৈলযুক্ত থাকাতে ঘর্ষণকালে ক্লেশিত হয় না। হস্তপদাদি অঙ্গের পেশী আমাদের ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, তাহাদিগকে ইচ্ছানুগ পেশী বলা যায়। হৃদয়, পাকযন্ত্র প্রভৃতি স্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, উহাদিগকে স্বৈরপেশী কহে।

অঙ্গসঞ্চালন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে আমাদের মনে অঙ্গসঞ্চালনের ইচ্ছা হইলে শরীরের দূরবর্ত্তী অংশগুলি কিরূপে সঞ্চালিত হয়? মনের সহিত অঙ্গবিশেষের কিরূপ

সম্বন্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হয়, আমাদের মস্তিষ্ক মনের যন্ত্রস্বরূপ; মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু হইতে শরীরের সকল স্থানে স্নায়ু নামক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই সকল স্নায়ু মনের আজ্ঞাবহ হইয়া যখন যে অঙ্গের সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই অঙ্গের পেশীকে সঙ্কুচিত করে। কতকগুলি স্নায়ু হৃদয় পাকযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। আর কতকগুলি, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া বাহ্য জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ রহিয়াছে। আমাদের শরীরের যে কোন স্থানে ভাবান্তর হউক না কেন, তাহা স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে বিজ্ঞাপিত হইয়া তাহার উদ্বোধ জন্মাইয়া দেয়। মস্তিষ্ক আমাদের সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তির আধার। মস্তিষ্কের কোন অংশ আহত বা বিনষ্ট হইলে মনোবৃত্তি বিশেষ নিস্তেজ অথবা এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। অন্যান্য জীবের উপরি মনুষ্য যে প্রাধান্য করিতেছে, উৎকৃষ্ট স্নায়ুযন্ত্র থাকাই তাহার প্রধান কারণ। যদি আমাদের স্নায়ুযন্ত্র এত সুকৌশলে গঠিত না হইত, তাহা হইলে মনুষ্য ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকিত না। স্নায়ুযন্ত্রের সবিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে পুস্তকের আকার বৃহৎ হইবে, এই আশঙ্কায় এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গেল। টেলিগ্রাফের তার যেরূপ তাড়িতের প্রভাবে অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে সংবাদ বহন করে, স্নায়ুগণ তাদৃশ কোন শক্তির প্রভাবে শরীরের সংবাদবাহক হইয়া রহিয়াছে। এই শক্তি শরীরেই উৎপন্ন ও ব্যয়িত হইতেছে। পর পৃষ্ঠায় স্নায়ুযন্ত্রের একটী প্রতিরূপ দেওয়া গেল।

ত্বক। শরীরের আচ্ছাদন চর্ম্ম। উহা দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে ও রক্তের দূষিত পদার্থ স্বেদরূপে বহির্গত হইয়া থাকে।

(১) মস্তিষ্ক ; (২) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ; (৩) মেরুদণ্ডীর মজ্জা। শ্বেত রেখা গুলি স্নায়ু।

স্বেদ নিঃসরণের জন্য ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। স্বেদ নিঃসৃত হইলে এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। হস্তের এক বর্গ ইঞ্চ ত্বকে এইরূপ ২৭০০ ছিদ্র লক্ষিত হয়। এই ছিদ্রকে লোমকূপ বলা যায়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সমস্ত শরীরের চর্ম্মে প্রায় ২৪ লক্ষ লোমকূপ আছে। লোমকূপ দিয়া স্বেদ অনুক্ষণই নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা সচরাচর বহির্গত হইবার পূর্ব্বে বাষ্পে পরিণত হয়, এই কারণে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিক পরিশ্রম করিলে, বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে এবং রোগ বিশেষে, স্বেদ এত শীঘ্র শীঘ্র ও এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে যে সমস্তই বাষ্পে পরিণত হইতে পায় না, কিয়দংশ জলীয় আকারে থাকিয়া যায় এবং আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। স্বেদের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি কোন কারণে তাহা বাষ্প হইতে না পারে, তাহা হইলেও জলীয় আকারে দেখা যায়। পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, কোনটী বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবার কালে নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে, অর্থাৎ তাহাকে শীতল করিয়া ফেলে। স্বেদ বাষ্পে পরিণত হইয়া এইরূপে শরীরের তাপ হরণ করিয়া থাকে; এই কারণেই ঘর্ম্ম হইলে আমাদের শরীর শীতল হয়।

ত্বক্ পরিষ্কৃত না রাখিলে নানা রোগ জন্মিয়া থাকে। আমাদের নখ ও কেশ চর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। কেশের ও লোমের মূল হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ বহির্গত হয়, তাহাতে উহার মসৃণতা সম্পাদিত হয়। স্বেদ ব্যতীত মলমূত্র রূপে এবং শ্বাসযন্ত্র হইতে বাষ্পাকারে শরীরের অনেক অপ্রয়োজনীয় বা দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

আমাদের চর্ম্মের উপরিভাগ নিয়তই পরিত্যক্ত হইতেছে। উহা অতিশয় লঘু, এজন্য সামান্য মলার ন্যায় সহজেই উঠিয়া যায়। স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা করিলে লোমকূপ সমূহ পরিষ্কৃত থাকে ও মৃতচর্ম্ম দূরীকৃত হয়।

পাকযন্ত্র। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দৃঢ় অস্থিময়

পাকযন্ত্র। ১ চিত্র

(গ) অন্ননালী। (পা) আমাশয়। (য) যকৃৎ।
(পি ক) পিত্তকোষ। (ক) ক্লোম। (প্লী) প্লীহা।
(অ) ক্ষুদ্র অন্ত্র। (ম) মলনির্গম।

মলনির্গমের পূর্ব্বেই বৃহৎ অন্ত্র।

পাক যন্ত্র। ২য় চিত্র
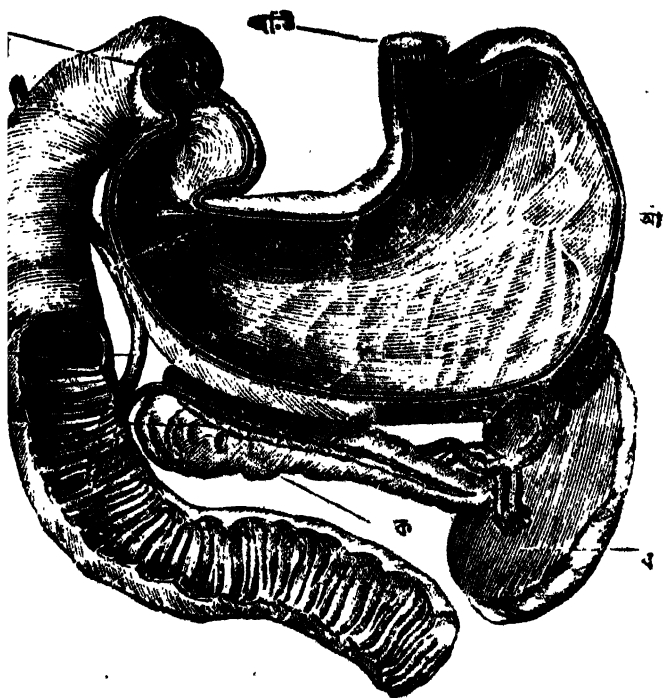
(আ) আমাশয়। (আ উ) আমাশয়ের উপরেরমুখ।
আ নী) আমাশয়ের নীচের মুখ। (পি র) পিত্তরস
(ক) ক্লোম। (ক র) ক্লোমরস।

কঙ্কাল ও চর্ম্মের অন্তর্গত স্থানে পাকযন্ত্র প্রভৃতি অবস্থিত। সকলেই পাকযন্ত্রের কার্য্য কিছু না কিছু পর্য্যালোচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তদ্দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ কার্য্য হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে উহার দুইটী চিত্রময় প্রতিরূপ দেওয়া গেল।

আমরা মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করি। দুগ্ধাদি তরল দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে হয়। ভুক্তদ্রব্য চর্ব্বণকালে দন্তদ্বারা পিষ্ট হয় ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ননালী নামক পথে গমন করে; পরে উদরের কিঞ্চিৎ বামভাগে থলির ন্যায় স্থানে উপস্থিত হয়; এই স্থানকে আমাশয় বলে। আমাশয়ে উপস্থিত হইবামাত্র তথা হইতে এক প্রকার মৃদু অম্লরস উৎপন্ন হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে পরিপাক হইতে থাকে। এই রসকে আমাশয়িক রস কহে। এই রসের সহিত মিলিত হইয়া আমাশয়ের পেশীবলে বারংবার ইতঃস্তত চালিত ও ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ দ্রব হয় ও অবশিষ্টভাগ কর্দ্দমের ন্যায় হইয়া উঠে। পরে উক্ত দ্রব্য এক নলাকৃতি সুদীর্ঘ নাড়ীতে প্রবেশ করে, এই নাড়ীর নাম ক্ষুদ্রঅন্ত্র বা পক্বাশয়। এই নাড়ীতে থাকিতে থাকিতে যন্ত্রবিশেষ হইতে নিঃসৃত আরও তিন প্রকার রসের সহিত ভুক্ত দ্রব্যের মিলন হয় ও তৎপরে পাকক্রিয়া সমাধা হয়। আমাদের উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ নামক এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতে পিত্তরস নির্গত হয়। আমাশয়ের নিম্নে আড়ভাবে অবস্থিত ক্লোম নামে এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই প্রকার রস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়া আসিয়া পক্বাশয়ের এক স্থানে একটী ছিদ্র দিয়া নির্গত হয়। আর এক

প্রকার রস পক্বাশয়ের গাত্র হইতে নির্গত হয়। এই তিন প্রকার রস, আমাশয়িক রস ও লালা, উহাদের মধ্যে একটীর অভাব বা অল্পতা হইলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

যে পাঁচ প্রকার পাচক রসের উল্লেখ করা গেল তাহাদের শক্তি একরূপ নহে। খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে রসবিশেষের কার্য্যকারিতা দেখা যায়। তৈলাদি পদার্থ ও মাংসের কোন কোন অংশ পরিপাক করিতে লালার সহায়তা প্রয়োজন হয় না। চাল, গম প্রভৃতি লালা ও অন্ত্রের রসযুক্ত না হইলে কোন মতে পরিপাক পায় না। কতকগুলি দ্রব্য আমাশয়িক রসে জীর্ণ হয়। জলীয় পদার্থ আমাশয় হইতেই শোষিত হয়।

পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে হইতে খাদ্যের সারভাগ ক্রমে ক্রমে আমাশয় ও পক্বাশয় সংলগ্ন অসংখ্য নাড়ীদ্বারা রক্তে নীত হইয়া তাহার পুষ্টিকারিতা সম্পাদন করে। অসারভাগ মলরূপে পরিণত হইয়া বৃহৎ অন্ত্রে সঞ্চিত হয়, এবং সময় অনুসারে নির্গত হইয়া পড়ে।

হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র। ভুক্ত দ্রব্য রক্তে পরিণত হয়। এই রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে দেহের অপচয় নিবারণ ও পুষ্টি সাধন করে। হৃদয়, ধমনী, কৈশিকা ও শিরা রক্ত সঞ্চালনের প্রধান সাধন। রক্ত ফুস্‌ফুস্, মূত্রযন্ত্র, ত্বক্, যকৃৎ প্রভৃতির দ্বারা বিশোধিত হইয়া দেহরক্ষার উপযোগী হয়। ক্রমে উহাদের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমতঃ হৃদয় ও ফুস্‌ফুসের এবং পরে রক্তসঞ্চালনের চিত্র দেওয়া যাইতেছে।

হৃদয় ও ফুসফুস্।
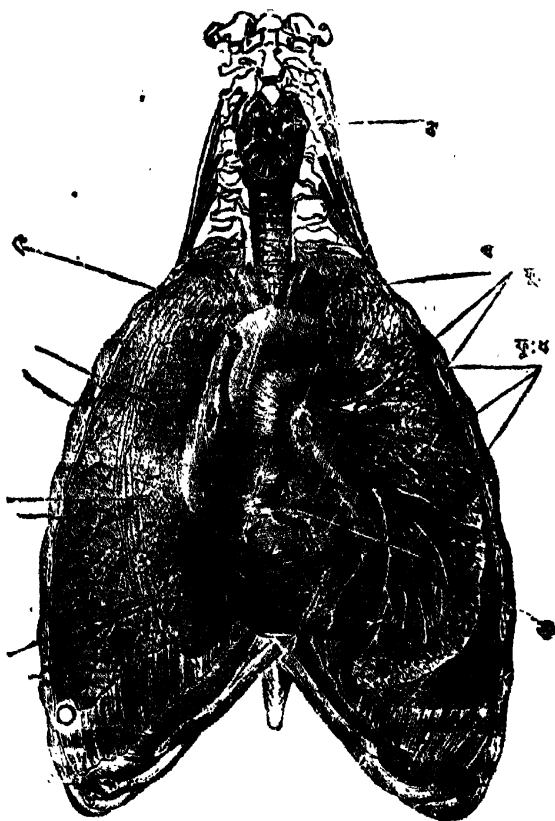
(ক) কণ্ঠনালী বা বায়ু প্রবেশ। দুই পার্শ্বে বিস্তৃত অংশ ফুসফুস্। মধ্যস্থানে হৃদয়।
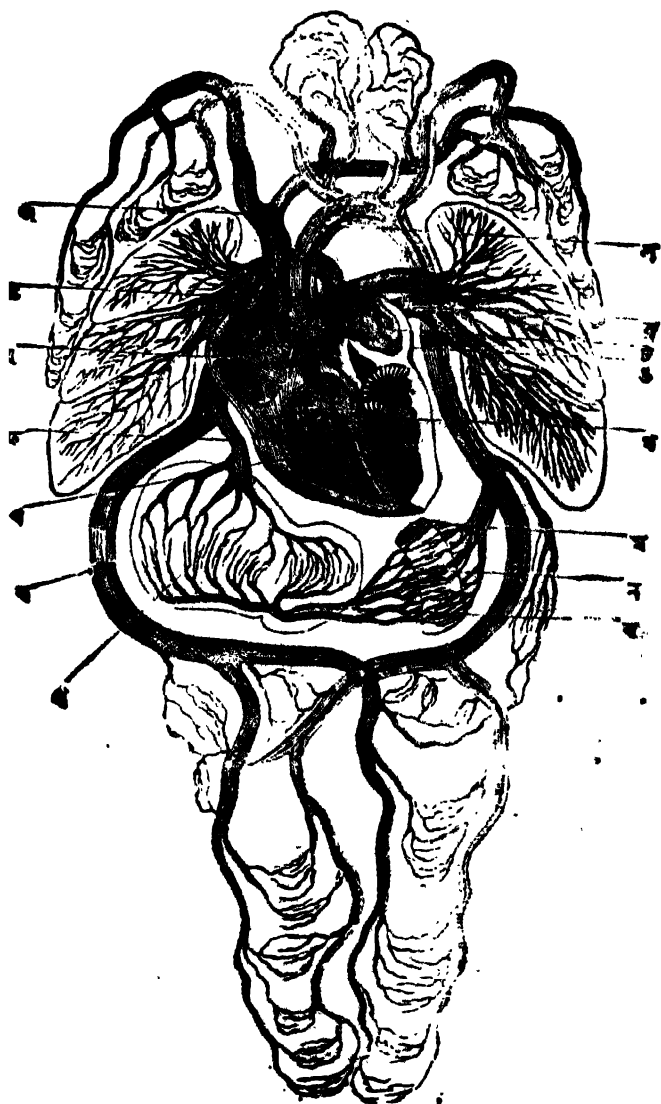
(ফু ধ) ফুসফুসীয় ধমনী

রক্ত-সঞ্চালনের ১ম চিত্রের ব্যাখ্যা।

(ঠ) ও (র) ফুস্‌ফুসীয় শিরা।

(ট) ফুস্‌ফুসীয় ধমনী।

(ঙ) ও (গ) হৃদয়ের বামকোটরদ্বয়।

(ঘ) ও (খ) হৃদয়ের দক্ষিণকোটরদ্বয়।

(জ) ও (ঝ) স্থূল শিরাদ্বয়।

ঈষৎ কৃষ্ণাভ রেখাগুলি ধমনী।

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলি শিরা।

(ন) আমাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি।

(ম) আমাশয় প্রভৃতির ধমনী। (প) যকৃৎ।

(ফ) যকৃৎ হইতে বহির্গত শিরা।

রক্ত-সঞ্চালনের দ্বিতীয় চিত্র ২৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

হৃদয় ও ফুসফুস্‌ আমাদের বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে অবস্থিত; মধ্যস্থলে হৃদয় ও দুই পার্শ্বে দুই ফুসফুস্‌। বিশোধিত রক্ত ফুসফুস্‌ হইতে আসিয়া হৃদয়ের বাম কোটরে উপনীত হয়, এবং তথাকার পেশীবলে একটী স্থূল রক্তবাহিকা নাড়ীতে প্রেরিত হয়। এই নাড়ী হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বক্রভাবে উঠিয়া পরে শরীরের অভ্যন্তর দিয়া নিম্ন প্রদেশে গমন করিয়াছে। উহার কয়েকটী শাখা মস্তিষ্ক, হস্তপদ, পাকযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সেইগুলির সূক্ষ্মতর নানা শাখা বহির্গত হইয়াছে। এই স্থূল নাড়ী ও তাহার শাখাদিগকে ধমনী কহে। ধমনী হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা বাহির হইয়া শরীরের সকল অংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। উহারা এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। উহাদিগকে কৈশিকা বলা যায়।
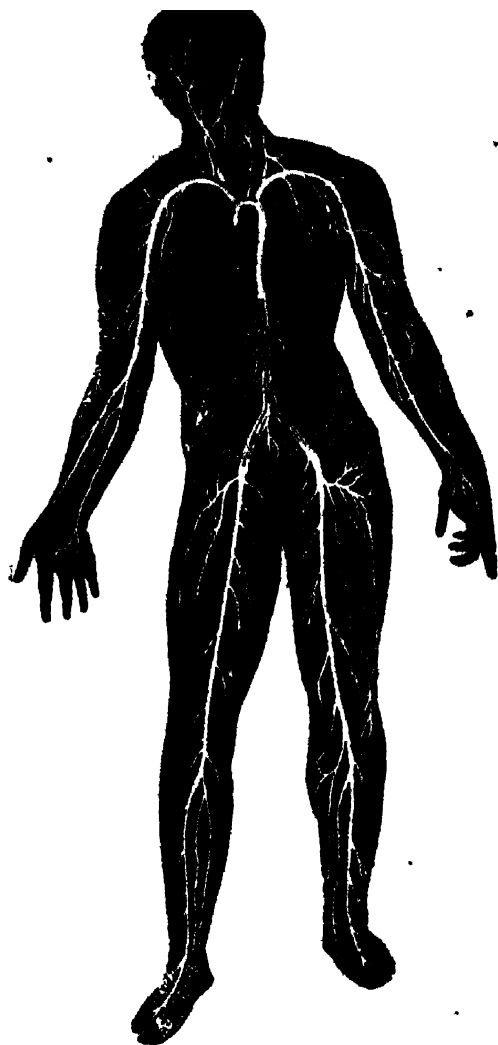
রক্ত-সঞ্চালন। ধমনী ও কৈশিকা পথে চালিত রক্ত দেহের পোষণ কার্য্যে লাগে। দেহের ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধিসাধন ইহার কার্য্য। রক্তের পুষ্টিকর ভাগ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইলে অবশিষ্ট অংশ ভিন্ন প্রকার নাড়ীবিশেষে নীত হয়। উহাদিগকে শিরা কহে। কৈশিকার অন্ত ও শিরার মূল একই, এজন্য রক্ত কৈশিকা হইতে শিরাতে সঞ্চরণ করিতে পারে। শরীরের ক্ষয়-প্রাপ্ত অংশ শিরার রক্ত সহ বাহিত হয়।

শিরাসকল প্রথমতঃ কৈশিকার ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালীতে আরম্ভ হয়। ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ইহাদের উত্তরোত্তর মিলনে অবশেষে দুইটী মাত্র বৃহৎ শিরা উৎপন্ন হয়। একটী মস্তক হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল হইতে, অপরটী উদর ও পদাদি নিম্ন প্রদেশ হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ কোটরে প্রেরণ করে। শিরাস্থ রক্ত হৃদয়ে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্যের রসের সহিত মিশ্রিত হয়। শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই শিরা ও ধমনী পাশাপাশী হইয়া অবস্থিত।

ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, শিরার রক্ত কাল। এইরূপ বর্ণের বিভিন্নতা, গুণের বিভিন্নতাবশতঃ হইয়া থাকে। দুই প্রকার রক্তের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান; তন্মধ্যে ধমনীর রক্তে অম্লজনক বায়ু ও শিরার রক্তে অঙ্গারক বায়ুর আধিক্য নিরূপিত হইয়াছে। রক্তে অঙ্গারক বায়ুর আতিশয্য ও অম্লজনকের অল্পতা হইলে প্রাণবিয়োগ হয়। রক্ত শিরা হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ কোটরে আসিবামাত্র একটী বৃহৎ ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে প্রেরিত হয়, এবং তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া ফুস্‌ফুসের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌ দুইটী ; দক্ষিণ ও বাম। দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং বামটী হৃদয়ের বামে অবস্থিত। দক্ষিণ ফুসফুস্‌ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ফুস্‌ফুস্‌ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষসংযোগে গঠিত। নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে, বায়ু উভয় ফুস্‌ফুসে যাইয়া বায়ু-কোষগুলিকে বায়ুপূর্ণ করে। বায়ুকোষের গাত্রে ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর অসংখ্য কৈশিকা ব্যাপ্ত আছে। এই সকল কৈশিকার গাত্র ভেদ করিয়া বায়ুস্থ অম্লজনকবাষ্প রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং রক্তস্থ দূষিতপদার্থসকল বায়ুকোষ পথে বহির্গত হয়। অঙ্গারক বায়ুর বিনিময়ে বায়ুস্থিত অম্লজনক রক্তে গৃহীত হইয়া উহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ সম্পাদন করে। অম্লজনক সমাগমে রক্ত বিশোধিত হইলে ফুস্‌ফুসের অসংখ্য * শিরা পথে আসিয়া পরিশেষে চারিটী প্রধান শিরা দিয়া হৃদয়ের বাম কোটরে উপ-নীত হয়, এবং হৃদয়ের পেশীবলে পুনরায় ধমনী পথে চালিত হইয়া শরীরপোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। বিশোধিত রক্ত হৃদয়ের বাম কোটর হইতে প্রেরিত হইয়া তথায় প্রত্যাগমন করিতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার নাম রক্তসঞ্চালন। ইংরেজেরা উহাকে রক্তের চক্রভ্রমণ বলিয়া থাকেন।

শ্বাসকার্য্য। নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কালে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার উপাদান বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদানের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধ বায়ুর ৫০০০ ভাগে, দুই ভাগ দ্ব্যম্লঅঙ্গারক বায়ু থাকে ; কিন্তু প্রশ্বসিত বায়ুর ১০০ ভাগের মধ্যে ৩। ৪। ৫। ৬

* যে সকল নাড়ীদ্বারা হৃদয়ে রক্ত আনীত হয়, তাহাদিগকে শিরা ও যদ্দ্বারা রক্ত হৃদয় হইতে শরীরে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে ধমনী কহা যায়। এইজন্য হৃদয় হইতে যে নাড়ী দ্বারা দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাকে ধমনী ও ফুস্‌ফুস্‌ হইতে যে দুই নাড়ী দিয়া বিশোধিত রক্ত হৃদয়ে আসিতেছে, তাহাদিগকে শিরা বলা গেল।

ভাগ এই বায়ু অবধারিত হইতেছে; এতদ্ভিন্ন উহাতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কিয়দ্ভাগ এমোনিয়া ও নানাপ্রকার জান্তব পদার্থ দেখা যায়। শেষোক্ত পদার্থ জনিত দুর্গন্ধ সচরাচর অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন বশতঃ উক্ত বায়ু দ্বারা আর নিশ্বসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। দ্বায়অঙ্গারক বায়ু ও বিষাক্ত জান্তব পদার্থের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং অম্লজনকের পরিমাণের হ্রাস হওয়াতে উহা প্রাণ নাশক হইয়া উঠিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কি প্রকারে উক্ত বিবিধ অভি-নব দূষিত পদার্থ ফুস্ফুস্ হইতে বহির্গত বায়ুতে উপস্থিত হইল। শরীরের মধ্যে প্রবেশকালে বায়ুতে এ সকল পদার্থ প্রায়ই ছিল না, সুতরাং তাহারা দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক কার্য্যবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

যকৃৎ ও প্লীহা। আমাদের শরীরের নিষ্প্রয়োজনীয় কিংবা দূষিত পদার্থ যে, কেবল ফুস্ফুস্ দিয়া বহির্গত হয়, এরূপ নহে। উহা ত্বক মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্র দিয়াও বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমাদের যকৃত যন্ত্রও এই কার্য্যের উপযোগী। আমা-শয়, প্লীহা, ক্লোম ও অন্ত্র হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃদয়াভিমুখে রক্ত প্রেরণ না করিয়া, একটী স্থূল শিরাপথে যকৃতে আনিয়া থাকে। ২৩ পৃষ্ঠার চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয় বোধগম্য হইবে। এই শিরার নানা শাখা প্রশাখা দ্বারা যকৃতের সর্ব্বস্থানে রক্ত প্রেরিত হয়। এবং তথা হইতে অবশেষে "ঝ" শিরাপথ দিয়া হৃদয়ে উপনীত হয়। ঐ রক্ত যকৃতে থাকিতে থাকিতে তাহা হইতে পিত্তরস বাহির হয়। পিত্তরস পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। পিত্তরসের কিয়দংশ

মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। রক্তের যে অংশ পিত্তরসরূপে বহির্গত হয়, যকৃতের পীড়া হইলে তাহা রক্তেই থাকিয়া যায়, তাহাতে সমস্ত শরীর হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে।

প্লীহা ও যকৃত পরস্পরের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে বোধ হয়, প্লীহা দ্বারা যকৃতের কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। ফলতঃ এই দুয়ের মধ্যে একটীর রোগ জন্মিলে, প্রায়ই অপরটীর রোগ জন্মিয়া থাকে। প্লীহা দ্বারাও রক্তের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খাদ্য।

আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি তাহার সারভাগ রক্ত রূপে পরিণত হইয়া শরীর পোষণ করে। অতএব যে সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হইতে পারে, সেই সকল পদার্থই আমাদের খাদ্য। চাল, ডাইল, গম, ঘৃত, মাংস, মাছ, আলু, দুধ, চিনি, তরকারী, ফল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমরা সচরাচর আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের পুষ্টিকারিতাগুণ থাকাতেই তাহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

খাদ্যের আদর্শ। শিশুগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্যবিধ আহারের প্রয়োজন হয়। তখন আর শুদ্ধ দুধের উপর নির্ভর করিলে চলে না। কিন্তু দুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকাতে তদ্দ্বারা শিশুশরীরপোষণ হয়, তৎসমুদয় নিরূপণ করিলে যে কিয়ৎ-পরিমাণে পূর্ণবয়স্কদিগের খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান স্থির

করা যাইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুগ্ধকে আদর্শ স্থির করিয়া খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন। ১০০০ ভাগ মাতৃস্তন্যে নিম্নলিখিত পরিমাণে কয়েক প্রকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জল	৮৮৯	(১)
ছানা বা পনিরময় পদার্থ ...	১৯	(২)
শর্করা	৪৪	(৩)
তৈলময় পদার্থ ...	২৭ ...	(৪)
নানাবিধ খনিজ পদার্থ ...	১	(৫)

এই পাঁচ প্রকার পদার্থের মধ্যে জল এবং লবণ, চূণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য, আমরা পৃথকরূপে খাদ্যের সহিত প্রয়োজনমত মিশ্রিত করিয়া লইতে পারি; অনেক সময়ে তাহারা খাদ্যের সহিত স্বতঃই মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধের যে অংশ দ্বারা পনির বা ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাকে পনিরময় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা গেল। উহাতে যবক্ষারজনক বিদ্যমান আছে; এজন্য উহাকে যবক্ষারজনক-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। অবশিষ্ট কয়েক প্রকার উপাদান যবক্ষারজনক-বিহীন। দুগ্ধে যে পাঁচ প্রকার উপাদানের উল্লেখ করা গেল তাহা সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যে সমান পরিমাণে ও একাকারে পাওয়া যায় না। যবক্ষার-জনক বিশিষ্ট উপাদান,—পক্ষ্যাদির ডিম্বে, মাংসে এবং গম চাল ডাল প্রভৃতি শস্যে পাওয়া যায়। শর্করা দ্বারা শরীরের যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, চাল, গম, সাগু, আরোরুট প্রভৃতির শুভ্রভাগ পরিপাক হইয়াও সেই কার্য্যে লাগে। শর্করা এবং চাল গম প্রভৃতির শ্বেতসার একজাতীয় পদার্থ বলা যাইতে পারে।

তৈলময় পদার্থ অনেক খাদ্যে স্বতঃই আছে। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজন মতে উহা খাদ্যে মিশ্রিত করিয়া লওয়া যায়।

যে পাঁচ প্রকার পদার্থের কথা লেখা হইল তাহার কোন-টার অভাব হইলে শরীর রক্ষা হয় না। যদি গম বা চালের শ্বেত-সার অথবা যবক্ষারজনক-বিশিষ্ট ভাগ পৃথক করিয়া কোন ব্যক্তিকে কেবল তাহার অবশিষ্ট ভাগ রন্ধন করিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর পরিপুষ্ট হয় না। কেবলমাত্র মাংস খাইয়া শরীর রক্ষা করাও কঠিন। দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন দ্রব্য নাই, কেবল যাহার উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল শরীর ধারণ করা যায়। শস্যাদির মধ্যে গম প্রধান। পুষ্টিকর বলিয়া গম অনেক দেশে ব্যবহৃত। উহাতে তৈলের ভাগ না থাকাতে আমরা ঘৃত সংযোগ করিয়া রুটি বা লুচি প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইউরোপীয়েরা পাঁউরুটীর সহিত মাখন খাইয়া থাকেন।

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তাহার সারাংশ দ্বারা শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পুনর্নির্ম্মিত হয়। চাল, গম প্রভৃতির শ্বেতসার শর্করা এবং তৈলময় পদার্থের যে অংশ শরীরের কার্য্যে লাগে, তাহা শরীরের অভ্যন্তরস্থ অম্লজনক যোগে তাপ উদ্ভাবন করে। সুতরাং এইগুলিকে কোন কোন রসায়নবেত্তা তাপ-উদ্ভাবক বলিয়া উল্লেখ করেন। এই গুলিতে অঙ্গারের ভাগ অধিক বলিয়া কখন কখন অঙ্গারময় খাদ্য বলিয়া অভিহিত হয়। মাংস, ছানা, ডিম্ব প্রভৃতি দ্রব্যে যবক্ষারজনক বিদ্যমান আছে, এই জন্য এইগুলি যবক্ষারজনকময় খাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। যবক্ষারজনক শরীরের পেশী যন্ত্রের একটী প্রধান উপাদান। যে খাদ্যে উক্ত পদার্থ নাই, তাহা খাইলে পেশীগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অধিক দিন উহার অভাব হইলে শরীর রক্ষা হয় না।

অঙ্গার ও যবক্ষারজনকময় পদার্থই আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু জল, লবণ, লৌহ প্রভৃতি উপাদান উদরস্থ না করিলেও অমরা জীবনধারণ করিতে পারি না। বায়ু হইতে আমরা যে অম্লজনক বাষ্প গ্রহণ করি, তাহাও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরপোষণ কার্য্যে লাগে। অতএব বায়ু আমাদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। জল, শরীরের সকল অঙ্গেই বিদ্যমান আছে; লবণ লৌহাদি,—রক্ত, পেশী প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়; চূণ প্রভৃতি কঠিন খনিজদ্রব্য দ্বারা অস্থি নির্ম্মাণ হয়। অঙ্গারময় পদার্থ দেহের সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাংস, ডিম্ব ও ছানা যবক্ষারজনকময় খাদ্যমধ্যে প্রধান বটে, কিন্তু উহাদেরও ১০০ ভাগের মধ্যে ৫৪ ভাগ অঙ্গার ও ১৬ ভাগ মাত্র যবক্ষারজনক।

ক্ষুধা। দেহ ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ শরীরের কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া গেলে, নূতন পদার্থের প্রয়োজন হওয়াতে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আহার গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ বোধ হয় যেন পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ক্ষুধা সর্ব্বশরীর ব্যাপী। উপবাসের পর আহার করিলে তৎক্ষণাৎ অনাহারের ক্লেশ যায় না। যে পর্য্যন্ত অন্নের কিয়দংশ পরিপাক হইয়া রক্তে মিলিত না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই শরীর সুস্থ হয় না।

কাহারও বা আহার গ্রহণের অল্পক্ষণ পরে কাহারও বা অধিকক্ষণ পরে ক্ষুধা উপস্থিত হয়। পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা শিশু ও বালকদিগের ক্ষুধা শীঘ্র হইতে থাকে; কারণ এই সময়ে শরীরের শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে থাকে, এই বৃদ্ধি ও দেহের জীর্ণ সংস্কার উভয়ের জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। সরীসৃপ ও মৎস্য অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষুধা সত্বর হয়। মনুষ্য

প্রভৃতি যে সকল জীবের রক্ত উষ্ণ, শীত হইলে তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সরীসৃপ প্রভৃতি শীতলরক্ত বিশিষ্ট জীবগণ শীতকালে প্রায় ক্ষুধিত হয় না, এবং অধিক শীতবোধ হইলে তাহারা এককালে আহার গ্রহণ করে না। তৃণশস্যাহারী জীব অপেক্ষা মাংসাদ জীবগণ অধিককাল অনাহারী থাকিতে পারে। ফলতঃ পরিশ্রম, শীতোষ্ণতা, বয়ঃক্রম, অভ্যাস প্রভৃতি কারণে ক্ষুধাকালের তারতম্য হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল অনাহারী ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর; শরীর শীর্ণ, মুখশ্রী বিবর্ণ, গণ্ডদেশ ক্ষীণ ও দেহ ক্রমে রক্তহীন হইয়া পড়ে। উদরে সাতিশয় যাতনা অনুভূত হয়, ও স্নায়ু যন্ত্রের অস্থিরতা বশতঃ অনেকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র উত্তর দেয় "আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি।" অঙ্গ সঞ্চালন অতি কষ্টকর হয়, কোন কার্য্যে উদ্যম থাকে না, উদরান্নের জন্যও হতভাগ্যেরা কর্ম্ম করিতে চাহে না। চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে আঁইসের ন্যায় পদার্থ উঠিতে থাকে। ক্রমে মুখে ও দন্তের মাড়িতে ক্ষত দৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে এক প্রকার পচা গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। বুদ্ধিশক্তিও ক্রমে অন্তর্হিত হয় এবং নিদ্রাভাবে হতভাগ্যেরা সাতিশয় কষ্ট পায়। খাদ্য ও পানীয় শূন্য থাকিলে ৪।৫ দিন, এবং শুদ্ধ খাদ্যাভাবে ১০।১৫ দিনের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ হয়। শিশুগণ অধিকক্ষণ ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না, এবং অনাহারী থাকিলে তাহারা সহসা কাতর হইয়া পড়ে।

পরিমিতাহার। কি পরিমাণে কি কি দ্রব্য আহার করিলে শরীর সবল থাকে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অভ্যাসই প্রধান। কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আহার করিয়া পরিপাক করিতে পারে; অন্য কেহ তৎপরিমাণে খাইলে

তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া পড়ে। এক ব্যক্তি যে দ্রব্য খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকে, অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইতে পারে। কিন্তু সচরাচর অনেকেই অতিভোজন করিয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে, যে পর্য্যন্ত উদর স্ফীত হইয়া না উঠে, ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ বিবেচনা মূর্খতা বশতই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে, ক্ষুধা শান্তি হইল কি না, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে অল্প সময়ে অধিক অন্ন উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে যে শীঘ্র শীঘ্র শরীরপোষণ হয়, এরূপ নহে। কখন কখন এদেশের স্ত্রীলোকদিগের অজ্ঞতাদোষে শিশুরা অতিভোজন করিয়া পীড়িত হয়।

অনেক বলবান ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষীণকায় ব্যক্তিরা অধিক আহার করে। তাহার কারণ এই, পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাহা কিছু খায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, সুতরাং তাহার সারাংশ শরীরের কার্য্যে লাগে; কিন্তু ঔদরিকের পাকযন্ত্র পরিপাক শক্তির অভাবে খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। উহারা অনেক দ্রব্য উদরস্থ করিয়াও অনাহারীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পরিমিতাহারী লোকেরা দীর্ঘজীবী হয়। প্রসিদ্ধ পার সাহেব ১২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও নবকুমারের মুখ দেখিয়াছিলেন, এবং ১৫২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সুস্থশরীরে ও পূর্ণবুদ্ধিশক্তি সহকারে রাজসভায় উপনীত হন। তিনি যে কঠিন নিয়মে যৎকিঞ্চিত আহার করিতেন, রাজবাটীতে তাহার অল্পমাত্র ব্যতিক্রম হওয়াতে এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বাজি রাখিয়া অধিক আহার করিয়া পীড়িত হইয়া কেহ বা ঐরূপ করিয়া মরিয়া গিয়াছে।

যথেচ্ছাচারী হইয়া আহার করিলে অজীর্ণ, বমন, প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। পীড়াকালে গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে তাহা জীর্ণ হয় না। ভুক্তদ্রব্য কয়েক দিন এমন কি কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ভাবে উদরে অবস্থিতি করিতে পারে। এজন্য পীড়াকালে আহার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

খাদ্যের পরিমাণ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কি পরিমাণে আহার করা উচিত? যদি সকল ব্যক্তির শরীর সমান হইত ও সকল অবস্থায় সমান খাদ্যের প্রয়োজন হইত তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইত। শরীরভেদে ও শরীরের অবস্থাভেদে আহারের পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণ স্থির করা দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির সকল সময়ের উপযুক্ত পরিমাণ নিরূপণ করাও দুষ্কর। বহুসংখ্যক লোকের আহার দেখিয়া গড় পড়তা করিলে যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণ জানা যায়, এরূপ নহে। প্রসিদ্ধ লুই কর্ণারো প্রথম বয়সে অনেক অনিয়ম করিয়াও শেষে প্রত্যহ দেড় পোয়া শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া খাইয়া ১০০ বৎসর বয়সে গতাসু হন। কিন্তু এরূপ অল্পাহারে যুবকেরা শরীর রক্ষা করিতে পারে না। শীতকালে এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক আহারের প্রয়োজন হয়, আর অলস অপেক্ষা শ্রমজীবী লোকে অধিক আহার করিয়া থাকে। যে পরিমাণে আহার করিলে পূর্ণবয়স্কদিগের সচরাচর চলিতে পারে, তাহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। বালকেরা ইহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে অন্ন গ্রহণ করিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিবে।

আহার করিবার অব্যবহিত পরে অধিক খাইয়াছি বলিয়া

বোধ হইলে অতিরিক্ত আহার করা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কিছু ক্ষুধা রাখিয়া খাওয়া ভাল। তাহা হইলে অজীর্ণ রোগে ক্লেশ পাইতে হয় না।

কত অল্প পরিমাণে আহার করিলে জীবন ধারণ করা যায়, তাহা এক্ষণে এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে। যৎকালে পারিস নগর জর্ম্মাণদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ পাঁচ ছটাক রুটী ও আধ ছটাক মাত্র মাংস প্রদত্ত হইত। তৎকালে উহাতে কোন অপকার দেখা যায় নাই। পরিশ্রমের তারতম্যানুসারে খাদ্যের পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। ডাক্তার লিথবি নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ে নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন। অঙ্কগুলি দ্বারা তত ঔন্স বা অর্দ্ধ ছটাক বুঝিতে হইবে।

প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিমাণ।

	যবক্ষারজনকময়	অঙ্গারময়
অলস ব্যক্তি	২.৬৭	৯.৬২
সামান্য পরিশ্রমী "	৪ ৫৬	২৯.১৪
অতি পরিশ্রমী "	৫.৮১	৩৪.৯৭

খাদ্যের পরিমাণ কম বা অনুপযুক্ত হইলে রক্তের দোষ, ভেদ, রক্ত আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মে। কারাগারস্থ ব্যক্তি, ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের মধ্যে অনেকে সময়ে সময়ে এই সকল রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে সৈনিকদিগেরও ঈদৃশ অবস্থা ঘটে।

বঙ্গদেশের ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে প্রত্যহ দুই বেলায় আধসের বা তিন পোয়া চাউলের ভাত ও এক ছটাক বা আধ পোয়া ডাল ও কিঞ্চিৎ মৎস্য, দুধ ও তরকারি খাইয়া পরিতৃপ্ত

হয়। এক্ষণে অনেক ডাক্তারের মত এই যে, মৎস্য বা মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে শরীর পোষণ কার্য্য উৎকৃষ্টতর রূপে সম্পাদিত হয় এবং শরীরের আন্তরিক বলও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

আহারকালে পরিশ্রম। আমাদের শরীরের যে অঙ্গ যখন চালনা করা যায়, তখন দেহস্থ রক্ত তদভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হয়। আহার করিবামাত্র পাকস্থলীর কার্য্যারম্ভ হয়; তখন উহাকে সামর্থ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎপ্রদেশে অধিক পরিমাণে রক্তের গতি হয়. কোন মতে এই গতির ব্যাঘাত হইলে পরিপাক কার্য্যেরও ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অতএব আহারকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলে অঙ্গবিশেষে বা মস্তিষ্কে রক্তের অধিক প্রয়োজন হওয়াতে, উহা উচিত পরিমাণে পাকযন্ত্রে গমন করিতে পারে না, সুতরাং পরিপাক কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিশ্রম করিলে, রক্ত যে সকল অঙ্গের ক্ষতি পূরণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইতে সহসা পাকযন্ত্রে ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং অনিষ্ট হয়। অতএব আহার করিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে এবং আহার কালে কোন গুরুতর পরিশ্রম করা অবিধেয়।

রন্ধন ও ভোজন। খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের উপযুক্ত করিবার জন্য আমরা রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা চাউল সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু ভাত অনায়াসে পরিপাক করা যায়। রন্ধন দ্বারা চাউল ও গমের শ্বেতসার সুখপাচ্য হইয়া উঠে, যবক্ষারজনক বিশিষ্ট ভাগ কোমল হয়, এবং তৈলাদি জমাট হইয়া যায়। আম্র প্রভৃতি কয়েকটী পক্ক ফল রন্ধন না করিলেও খাওয়া যায়, কারণ তাহারা পূর্ব্বেই সূর্য্যপক্ক হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমতঃ রন্ধন ও পরে দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকি। চর্ব্বণ করিবার সময় খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেক রূপান্তর করিয়া থাকে। ভাত ও রুটির শ্বেতসার যে লালা সংযোগে শর্করার ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা স্বাদদ্বারাই অনুভব করা যায়। অতএব রন্ধনকালে অন্ন যাহাতে অপক্ক না থাকে এবং চর্ব্বণ সময়ে যাহাতে সুন্দররূপে পিষ্ট ও লালামিশ্রিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন করে তাহাদিগকে এ বিষয়ে গুরুতর অপরাধী বলিতে হইবে।

পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যই রন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে এত কারুকরি উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, যে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রন্ধন সময়ে ঘৃত এবং মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি, পলাণ্ডু প্রভৃতি নানা মসলা অধিক পরিমাণে খাদ্যে সংযুক্ত হওয়াতে তাহার গুণের এত প্রভেদ করিয়া ফেলে যে তাহা আর সহজে পরিপাক করা যায় না। অধিক পরিমাণে খাইলে পিপাসা উপস্থিত হয়, এবং পাকযন্ত্রের অভ্যন্তর প্রপীড়িত হওয়াতে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পলান্ন প্রভৃতি ঘৃতমসলাযুক্ত দ্রব্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক পরিমাণে সহ্য হইবার নহে। অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈলযুক্ত দ্রব্য ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি মেরুসন্নিহিত শীতপ্রধান দেশে বিশেষ উপকারী। সেখানে উহা দ্বারা যেমন সহজে শারীরিক তাপরক্ষা ও শীতনিবারণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাইতে গেলে আর একটী দোষ হইয়া থাকে। মসলার লোভে অনেকে অপরিমিত ভোজন করিয়া বসেন। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। অধিক মসলাযুক্ত

দ্রব্য খাওয়া অবৈধ বলিয়া যে স্বাদগন্ধশূন্য মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য আহার করিতে হইবে এমত নহে। যাহা খাইতে অনিচ্ছা হয়, তাহা পরিপাক করা কঠিন।

আমরা অনেক দ্রব্য তৈল বা ঘৃত দিয়া ভাজিয়া খাই। কোন কোন দ্রব্য সিদ্ধ করিলে অনায়াসে পরিপাক করা যায়, কিন্তু ভাজিলে প্রায় দুষ্পাচ্য হইয়া উঠে। এজন্য দুর্ব্বল শরীরে কোন কোন ভাজা জিনিষ খাওয়া অবৈধ। খাইলে অজীর্ণ বুক-জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

প্রত্যহ এক দ্রব্য খাইলে আহারে অরুচি হয়, এজন্য আবশ্যক পরিমাণে আহার করা যায় না; সুতরাং শরীর পুষ্টিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই কারণে মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বোধ করি তাহার উদ্দেশ্য এই। এতদ্ভিন্ন একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় লঘু আহারের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত।

খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, এবং তাহাতে পাকযন্ত্র সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আহারান্তে যখন আমাশয়ের কার্য্য হইতে থাকে, তৎকালে অধিক পরিমাণে শীতল জল, বরফ বা বরফজল পান করিলে আমাশয়িক রসের শক্তির হ্রাস হয় এবং পাকযন্ত্রাভিমুখে উচিত পরিমাণে রক্তের গতি হইতে পারে না, সুতরাং অজীর্ণ দোষ জন্মিয়া যায়।

পরিপাক কাল। পরিপাক কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ ৩। ৪ ঘণ্টা কালের প্রয়োজন। কিন্তু কেহ কেহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর কিছু কিছু আহার করিয়া থাকেন। এইরূপ করাতে পাকযন্ত্রসকল বিশ্রামাভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিপাকান্তে

২ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম না পাইলে যন্ত্রগুলি পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে না। অতএব একবার আহার করিলে তাহার ৪।৫ ঘণ্টা মধ্যে দ্বিতীয়বার আহার করা অনুচিত।

এদেশে অনেক অধিক বয়স্ক ছাত্র এবং আফিসের কর্ম্মচারী প্রাতঃকালে ৯ টা বা ১০ টা বেলার মধ্যে একবার পূর্ণমাত্রায় আহার করেন, পরে বিদ্যালয় বা কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কিছু জলখাবার গ্রহণ করেন এবং পুনরায় রাত্রিকালে পূর্ণমাত্রায় আহার করেন। এরূপ বন্দোবস্ত এদেশের কার্য্য-প্রণালী ও গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর অনুযায়ী বটে কিন্তু শিশুদিগকে উপরিউক্ত তিনবার ব্যতীত অন্য সময়েও আহার দেওয়া আবশ্যক। উহাদিগকে প্রত্যূষে একবার এবং মধ্যাহ্নে একটা বেলার সময় একবার কিছু খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বয়স, অবস্থা ও পরিশ্রম ভেদে আহারের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কোন এক নিয়মে সকল ব্যক্তির চলিতে পারে না। এদেশের উচ্চজাতীয় হিন্দু বিধবা এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন লোক প্রত্যহ একবার মাত্র আহার করেন। অধিক বয়সে এরূপ অভ্যাস করিলে অনেকের সহ্য হয় বটে কিন্তু শৈশব ও বাল্য কালে ইহাতে শরীর রক্ষা হয় না।

মাংস ভোজন। আমরা মাংস ভোজন না করিয়া অনায়াসে দীর্ঘজীবী হইতে পারি। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান সকল পাওয়া যায়. সুতরাং মাংস না খাইলে শরীর রক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু মাংস অতিশয় পুষ্টিকর এবং উহাতে যবক্ষারজনকময় পদার্থ যে ভাবে যে পরিমাণে আছে, তাহাতে দেহনির্ম্মাণকার্য্য সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংস সহজে জীর্ণ হয়। কোন কোন পক্ষীর ডিম্ব

ও দুগ্ধ মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর। এই সকল দ্রব্য পুষ্টিকর ও সুস্বাদু বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শীত-প্রধান দেশে মাংস যেরূপ প্রয়োজনীয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তত নহে; কিন্তু শেষোক্ত প্রদেশেও ডাল, ভাত, রুটী ও নানাবিধ তরকারীর সহিত মৎস্য মাংসাদি পরিমিত রূপে ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকের এইরূপ মত যে, অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর ও বলকর খাদ্য গ্রহণ করিলে বাঙ্গালী-দিগের শারীরিক বল বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাদের মতে মৎস্য মাংসাদির ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে ভাল হয়। সে যাহা হউক, সময় বিশেষে মাংস খাওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। যখন রোগ-দ্বারা শরীর শীর্ণ হয়, তৎকালে অল্প পরিমিত দ্রব্যে অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে এরূপ খাদ্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস্য ও মাংস ভিন্ন আর কোন দ্রব্যের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হয় না। উদরাময় ও অন্ত্রের পীড়া থাকিলে অধিক দুগ্ধ পরিপাক করার শক্তি থাকে না, এরূপ স্থলে মাংসই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমাদের দেশে যে কুৎসিৎ প্রণালীতে মাংস রন্ধন করা হয়, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, সহজ শরীরেও উহা পরি-পাক করা কঠিন হয় শূল্য বা সিদ্ধ মাংস ও মাংসের কাথ রোগীর পথ্য। ছাগ, মেষ, হরিণ ও পক্ষিবিশেষের মাংস লঘুপাক ও পুষ্টিকর। রোগাক্রান্ত জীবের মাংস ও পচা মাংস বিষবৎ পরিহার করিবে।

মৎস্য। আমরা যে কয়েক প্রকার মৎস্য খাইয়া থাকি, তন্মধ্যে রোহিত, মিরগেল ও কাতলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ক্ষুদ্র মৎস্য রোগী-দিগের উপযোগী, উহাতে তৈলের ভাগ অধিক না থাকাতে সহজে পরিপাক হয়। কৈ, মাগুর, শিঙ্গি, মৌরলা, বাটা, পাঁকাল প্রভৃতি মাছ রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। কোন মৎস্য জলাশয় হইতে

তুলিয়া দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়া থাইলে আর তদ্রূপ উপকারী হয় না। ইলিশ মাছ পুষ্টিকর, কিন্তু অত্যন্ত তৈলময় বলিয়া উদরাময় রোগে নিষিদ্ধ। চিঙ্গড়ী ও কাঁকড়া সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য উহা অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে। বড় বড় মৎস্য উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। লোণা মাছ দুষ্পাচ্য। রোগাক্রান্ত ও পচা মাছ ও যে মৎস্যের শরীরে কীট জন্মিয়াছে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

ডিম্ব। হংস প্রভৃতি কয়েকটি পক্ষীর ডিম্ব অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাজিবার বা সিদ্ধ করিবার সময়ে নিতান্ত কঠিন হইলে, উহা গুরুপাক হইয়া উঠে। ডিম্ব দুই মিনিট কাল মাত্র অত্যুষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত সহজে পরিপাক হয়। কাঁচা ডিম অতি লঘুপাক, কিন্তু উহা খাইতে অনেকেরই শ্রদ্ধা হয় না। ডিম্বের বিশেষ পুষ্টিকারিতা গুণ আছে।

দুগ্ধ। দুগ্ধ সকল দেশে ও সকল সময়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উহা অন্যান্য খাদ্যের আদর্শ স্বরূপ; বয়োবৃদ্ধি হইলে লোকে অল্প দুগ্ধ খাইয়াই তৃপ্ত হয়। দুগ্ধ ভাত অপেক্ষা অধিক কালে জীর্ণ হয়। কেহ বা ঘন, কেহ বা পাতলা দুধ খাইলে অসুস্থ হন। এ বিষয়ে অভ্যাসই প্রধান। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাইবার প্রথা অতি উৎকৃষ্ট। দুধে কোন দূষিত পদার্থ বা রোগের বীজ মিশ্রিত থাকিলে তাহা জ্বালের সময় দোষবিহীন হইয়া যায়।

এদেশে সচরাচর গোদুগ্ধ প্রচলিত; কিন্তু কোন কোন স্থানে মহিষের দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। উহা অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও গুরুপাক এবং উহাতে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। রক্তামাশয় রোগে বৈদ্যেরা ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং শৈশবকালে সন্তানেরা মাতৃস্তন্য না পাইলে গর্দ্দভ দুগ্ধ পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ থাকিতে পারে। গাধার দুগ্ধে মাতৃস্তন্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে

শর্করা বিদ্যমান আছে, কিন্তু তৈলের ভাগ কম। গো-দুগ্ধ ও গাধার দুগ্ধ সমান পরিমাণে মিশাইলে প্রায় মাতৃস্তন্যের তুল্য হয়।

যে পশুর দুগ্ধ পান করা যায়, তাহাকে সুস্থ শরীরে রাখা আবশ্যক এবং তাহার বৎস যাহাতে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। গরুর বাছুর মরিলে তাহার দুগ্ধ শিশুদিগকে পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। উৎকৃষ্ট কাঁচা ঘাস খাইলে গরুর দুগ্ধ ভাল হয়। গরুর গর্ভ হইবার কিছুদিন পরে দুধের গুণের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

দুধে যে যে উপাদান আছে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পশুর দুধে ঐ সকল উপাদান ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এদেশে টিনের কোটায় করিয়া যে গাঢ় বিলাতী দুধ বিক্রয় হয়, তাহা খাইতে অতি উত্তম, কিন্তু কোন কোন ডাক্তারের মতে তাহা বেশী দিন খাইলে ছোট শিশুদিগের অনিষ্ট হয়। দুধে জল মিশাইলেও উহার গুণের ব্যত্যয় হয়।

গো-দুগ্ধ পরীক্ষা। দুগ্ধ কৃত্রিম কিনা তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করা যাইতে পারে। উহা একটি দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে আস্তে আস্তে ঢালিবে। যদি দুগ্ধ কৃত্রিম না হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া দৃষ্টি চলিবে না, উহার বর্ণ শ্বেত দেখা যাইবে, উহাতে কোন প্রকার অস্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ অনুভূত হইবে না, এবং দুধ ঢালিবার পরে গ্লাসের তলায় কোন প্রকার তলানি পড়িবে না। যদি শ্বেত বর্ণের তলানি দেখা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, দুগ্ধে চা খড়ি কিংবা শ্বেতসার বা পালো মিশ্রিত করা হইয়াছে। পরে দুগ্ধ অল্প জ্বাল দিলেও পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি বিদ্যমান থাকিবে।

দুগ্ধ স্বভাবতঃ জল অপেক্ষা ভারী। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ হইলে দুধের ১০২৪ হইতে ১০৩৫ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব দুধে জল মিশাইলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাস হয়। দুগ্ধ পরিমাপক বা লাক্টমিটর নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহার দ্বারা দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজে পরীক্ষা করা যায়। উহার মূল্য ন্যূনাধিক দুই টাকা এবং উহা কলিকাতায় অনেক ঔষধালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দধি প্রভৃতি। সস্থ বা চিনিমিশ্রিত দধি ও ঘোল স্বাস্থ্যপ্রদ। ঘৃতের ভাগ পৃথক্ হওয়াতে ঘোল সহজে জীর্ণ হয় দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত প্রধান, উহা অনেক কার্য্যে লাগিয় থাকে। ঘৃত অপেক্ষা মাখন সুস্বাদ ও সহজে পরিপাক হয় সরে ঘৃতের ভাগ অধিক, এজন্য উহা অল্প পরিমাণে খাওয় উচিত। অনেক পীড়াতে এ সকল খাদ্য নিষিদ্ধ। উত্তাপ দ্বার ক্রমে শুষ্ক করিলে দুগ্ধ হইতে ক্ষীর উৎপন্ন হয়। ক্ষীর অধিব খাইলে পীড়া হয়। ছানা অতিশয় পুষ্টিকর, কিন্তু সহজে পরিপাব হয় না।

তণ্ডুল, গোধূম ইত্যাদি। তণ্ডুল বঙ্গদেশের প্রধা খাদ্য। গোধূম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যও এদেশের স্থান বিশেষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এস্থলে সংক্ষেপে এ গুলির বিবরণ লেখা যাইতেছে।

ধান্য প্রধানতঃ ত্রিবিধ, যথা ষাষ্টিক, আশু ও হৈমন্তিক ষাষ্টিক ধান্যের নাম বোরো ধান, উহা চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রায় ৬০ দিনের মধ্যে জন্মে। আশুধান্য বর্ষাকালে, এবং হৈম- ন্তিক বা আমন কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যে উৎপন্ন হয়। বোরো ও আশুধান্য যেখানে উৎপন্ন হ

তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়। হৈমন্তিক অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সুস্বাদ ও লঘুপাক, এজন্য উহা দেশদেশান্তরে নীত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল উৎকৃষ্ট। এই তণ্ডুল আকৃতি, স্বাদ ও ঘ্রাণ ভেদে নানাজাতীয় বলিয়া অভিহিত হয়। কলিকাতায় বালাম, মুগি ও দাদখানি চাল সমধিক আদৃত।

নূতন তণ্ডুল অপেক্ষা পুরাতন তণ্ডুল সহজে জীর্ণ হয়। অনেক চিকিৎসকের মত এই যে, নূতন ধান্যের তণ্ডুল তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার করিলে উদরাময় প্রভৃতি রোগ হয়। কেহ কেহ পরবর্ত্তী বর্ষাকালের পূর্ব্বে উহা ব্যবহার করেন না। পুরাতন দাদখানি চাউল রোগীর পক্ষে উপকারী। গোপালভোগ, বাদসাহভোগ, রান্ধুনী পাগলা প্রভৃতি চাউলের ভাত রান্ধিলে তাহার সুঘ্রাণ দূর হইতে অনুভব করা যায়।

সিদ্ধচাউল অপেক্ষা আতপ তণ্ডুল পুষ্টিকর। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চজাতীয় বিধবার মধ্যে প্রায় সকলেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দেশবাসী ইংরেজেরাও আতপান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ডাক্তার এডওয়ার্ড স্মিথ যে তণ্ডুল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ১০০০ অংশে নিম্নলিখিত উপাদান ছিল।

যবক্ষারজনকময় পদার্থ	৬৩
শ্বেতসার	৭৯১
শর্করা	৪
তৈল	৭
জল	১৩০
খনিজ পদার্থ	৫

ধান্য হইতে খৈ ও চিড়ে প্রস্তুত হয় এবং চাল হইতে মুড়ি ও চাল ভাজা প্রস্তুত হয়; ভাজাচিড়ে ও মুড়ি লঘুপাক। খৈ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া অরকালে রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়। ভাত একঘণ্টাকালের মধ্যে জীর্ণ হয়।

গম হইতে ময়দা, আটা ও সুজী প্রস্তুত হয়। লোকে ইহা হইতে রুটী, কচুরি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। ময়দায় উৎকৃষ্ট লুচী হয়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। অনেক সভ্যজাতির মধ্যে গমের রুটী প্রধান খাদ্য। ইহা তণ্ডুল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও বলকর। ময়দা প্রস্তুত করিবার সময় লোকে গমের সহিত যব, চাউল, ভুট্টা প্রভৃতি মিশাইয়া অনেক সময় উহার গুণের ব্যত্যয় করিয়া ফেলে।

১০০০ অংশ ২ নং ময়দার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ডাক্তার স্মিথ সাহেবের গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যবক্ষারজনকময় পদার্থ	১০৮
শ্বেতসার	৬৬৩
শর্করা	৪২
তৈল	২০
জল	১৫০
খনিজ পদার্থ	১০

গমের বিলাতী রুটী ৩।৪ ঘণ্টা মধ্যে জীর্ণ হয়।

যবের ছাতু প্রস্তুত করিয়া অনেকে ব্যবহার করেন। ইহার সহস্র অংশে নিম্নলিখিত উপাদান দৃষ্ট হয়।

যবক্ষারজনকময় পদার্থ	...	...	...	৬৩
শ্বেতসার	...	...	...	৬৯৪
শর্করা	..	...	...	৫৯
তৈল	...	..	...	১৪
জল	...	...	...	১৫০
খনিজ পদার্থ	...	...	...	২০

যব জীর্ণ হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে।

ভুট্টা বিহার ও ছোটনাগপুর প্রদেশের একটী প্রধান খাদ্য। উহা পাকিয়া শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে খাইতে অতি সুস্বাদ। ভুট্টার দানা পেষণ করিয়া গুঁড়া করিলে তদ্দারা রুটী প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সহস্রাংশে নিম্নলিখিত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যবক্ষারজনকময় পদার্থ	...	...	...	১১০
শ্বেতসার	...	...	..	৬৪৮
শর্করা	...	...	...	৪
তৈল	...	..	...	৮১
জল	...	...	...	১৪০
খনিজ পদার্থ	...	...	...	১৭
				১০০০

এদেশে চিনা, ভুরা, কদু প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার শস্য উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়। এই গুলি তত অধিক পরিমাণে প্রচলিত নহে।

বঙ্গদেশের শ্রমজীবী লোকেরা প্রধানতঃ চাউল ও ডাল খাই-য়াই জীবনধারণ করে। ডালে যবক্ষারজনকময় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, এজন্য উহা ভাতের সহিত খাইলে অনায়াসে শরীর রক্ষা হইতে পারে। ডালের মধ্যে মসুর, মুগ, ছোলা, অর-হর ও মাসকলাই সচরাচর ব্যবহৃত। ডালে ঘৃত অথবা তৈল সংযোগ করা আবশ্যক, নতুবা সুস্বাদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন দীর্ঘকাল ধরিয়া খেঁসারীর ডাল খাইলে পক্ষাঘাত রোগ হয়। কিন্তু উহা অনেক স্থানে প্রচলিত এবং উহার দোষের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মটর অন্যান্য ডালের ন্যায় পুষ্টিকর নহে। পাটনাই মটর অপেক্ষাকৃত ভাল। কাঁচাকলাইর ডালের ঝোল উদরাময় রোগে প্রশস্ত। অনেকে অসিদ্ধ ডাল খাইয়া রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শরীরে ডালের সার পরিত্যাগ করিয়া ঝোল খাইলে চলিতে পারে।

তরকারী। তরকারীর মধ্যে অনেকগুলিতে যবক্ষার-জনকময় পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে ঐগুলি বিলক্ষণ পুষ্টিকর। এতদ্ভিন্ন উহাতে অঙ্গারময় পদার্থ, নানাবিধ খনিজ পদার্থ এবং কিয়ৎপরিমাণে তৈলময় পদার্থের ভাগ থাকাতে তরকারী বিলক্ষণ উপকারী। বাস্তবিক দীর্ঘকাল ধরিয়া তরকারী ও ফল না খাইলে রক্তের বিকৃতি জন্মে।

তরকারীর মধ্যে কয়েক প্রকার আলু, পটল, বেগুন, ইচড়, কাঁচকলা, কাঁটালের বিচি, বিট্‌ শালঙ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, গাজর ও মানকচু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন ডুমুর, মোচা, পেঁপিয়া, সিম, লাউ, কুম্মাণ্ড, উচ্ছে প্রভৃতি তরকারী এদেশে সচরাচর ব্যব-হৃত হয়। আমরা যে সকল শাক ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থ অল্প এবং তাহার কঠিন ভাগ

দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়। শাকজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে বাঁধাকপি, কপকা, ও পালঙ্‌শাক অতি সুখাদ্য, কিন্তু অধিক খাইলে পীড়াদায়ক হয়। সুস্থ শরীরে অন্যান্য খাদ্যের সহিত অল্প পরিমাণে খাইলে শাকে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বরং শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোন কোন উপাদান ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পল্‌তা, পাট, হিঞ্চে, গান্ধাল প্রভৃতি শাক বিশেষ উপকারী।

অম্ল। দধি, ঘোল, লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি দ্রব্য সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে আহারের শেষে খাইলে অপকার হয় না, বরং পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। তীব্র অম্লরস অধিক পরিমাণে খাইলে রোগ জন্মে। জ্বরবিশেষে লেবু মহোপকারী। অম্ল যেরূপ মুখরোচক এরূপ আর দেখা যায় না। এদেশে যে সকল আচার প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে অনেকগুলি সুস্বাদ ও উপকারী।

মিষ্টান্নাদি। প্রায় সকল লোকেই মিষ্টান্ন খাইতে ভাল বাসেন। এজন্য উহা সকল দেশেই ব্যবহৃত। আমাদের দেশে ইক্ষু, খেজুর প্রভৃতি গাছের রসে গুড় প্রস্তুত হয়, উহা পরিষ্কার করিয়া চিনি করিলে তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে পারে। যে কোন দ্রব্যের সহিত চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহাই সুস্বাদ হইয়া উঠে। নারিকেল, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতির সহিত চিনি মিশাইয়া অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়, এবং ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি চিনির সংযোগে নূতন স্বাদযুক্ত হয়।

এতদ্দেশীয় পিষ্টকাদি প্রায়ই অনিষ্টকর। কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে বিশেষ পীড়াদায়ক হয় না। সচরাচর বাজারের মেঠাই, লুচি, কচুরী এ রূপ জঘন্য উপাদানে নির্ম্মিত যে তাহা খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা; এ সমুদায় যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

গুড় অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। উহা পুষ্টিকর এবং উহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। বালকেরা গুড় খাইতে ভালবাসে, উহা সপ্তাহে ২।৩ বার অল্প করিয়া খাইতে দিলে উপকার হইতে পারে। নূতন মধু অতি মুখপ্রিয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত খাইলে উহাতে উপকার আছে। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন সহ্য হইতে পারে। অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাইলে উদরাময়, কৃমি ও দন্তপীড়া জন্মে। চিনি, গুড় ও মধু প্রায় শরীরের তাপ উদ্ভাবন কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায়।

ফলমূল। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কয়েক জাতীয় ফল অতি মনোহর। উহাদের স্বাদ ও ঘ্রাণ এত উৎকৃষ্ট যে সকল অবস্থার লোকেই ঐগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। আম্র, দাড়িম, লিচু, আঙ্গুর, কমলালেবু, আতা, কালজাম, গোলাপজাম, জামরুল, তুঁত, আনারস, রম্ভা, পেঁপিয়া প্রভৃতি যে সকল ফল আমাদের দেশে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের তুল্য বুঝি আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। কাঁটাল, পেয়ারা, নারিকেল, খেজুর, তালশাঁস প্রভৃতি ফলও উত্তম, কিন্তু অধিক পরিমাণে উদরস্থ করিলে অসুখ হয়। কোমল নারিকেল সহজেই পরিপাক হয়। নারিকেলের জল ও ইক্ষু পিপাসাকালে কখন কখন খাওয়া মন্দ নহে। খরমুজ, ফুটী, তরমুজ ও শসা অল্প পরিমাণে খাওয়াই ভাল। এই গুলি, যেরূপ শীতল সেরূপ লঘুপাক নহে। পানিফল, কেসুর, শাঁকআলু প্রভৃতি চিবাইয়া রস খাওয়া মন্দ নহে। রোগীদিগের পক্ষে এইগুলি অতি স্নিগ্ধকর। বেল, উদরাময় রোগে বড় উপকারী। কাঁচা বেল পোড়াইয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পুরাতন রক্তামাশয় রোগের উপশম হয়।

পাকা বেলের সরবৎ পান করিলে মলবদ্ধ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

ফলের মধ্যে বেদানা অতি মুখপ্রিয়, পুষ্টিকর ও পীড়াকালে উপকারী। কাবুল হইতে যে কয়েক প্রকার ফল আসিয়া থাকে, তাহা অধিক খাইলে পীড়া হইয়া থাকে। খেজুর, মনক্কা, কিশমিশ্, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি রেচক দ্রব্য কখন কখন পীড়াদায়ক হয়।

দীর্ঘকাল টাটকা ফল ও তরকারী না খাইলে রক্ত-বিকৃতি রোগ জন্মে। অনেকে ফল খাইয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছেন এবং কিছু ফল খাইলে যে, শরীর সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। রাত্রিকালে অধিক ফল খাওয়া ভাল নহে।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেকে এই সকল উৎকৃষ্ট ফল পাকিবার সময় অপেক্ষা করে না, অপক্কাবস্থাতেই ফল খাইতে আরম্ভ করে। শিশুগণের মধ্যে অনেকেই কাঁচা ফল খাইয়া উদরাময় রোগগ্রস্ত হয়, এবং কেহ কেহ অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। শিশুসন্তানদিগকে সর্ব্বদা উপযুক্ত পরিমাণে সুপক্ক ফল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর কাঁচা ফল খাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না।

স্থলবিশেষে পথ্য। যাহাদের শরীরে অধিক মেদ সঞ্চয় হয়, তাহাদিগের পক্ষে মাখন, ঘৃত, শর্করা, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, আলু প্রভৃতি অনিষ্টকারী। কম করিয়া আটার রুটী, ডিম্ব, চর্ব্বিশূন্য মাংস, মৎস্য, মুগ, অরহরের ডাল এবং ফল ও হরিদ্বর্ণের তরকারী খাইলে মেদের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, যাহারা অতিশয় কৃশ তাহাদের সম্বন্ধে ঘৃত, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য উপকারী।

অন্নমণ্ড, যবমণ্ড, এরোরুট, সাগুদানা প্রভৃতি দুর্ব্বল ও

পীড়িত অবস্থায় বিশেষ উপকারী। অনেকে পীড়াকালে এ সকল খাইতে অনিচ্ছুক হইয়া ভ্রম বা লোভবশতঃ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক দ্রব্য খাইয়া পাকস্থলীকে দূষিত করিয়া ফেলেন। রুটী অপেক্ষা অন্নমণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি সহজে পরিপাক হয়। যবের রুটী যকৃৎ দোষে একটী প্রধান পথ্য।

পাত্রাদি পরিষ্করণ। এতদ্দেশে অনেক সময় রন্ধন ও ভোজনপাত্রের দোষে পীড়া হয়। রন্ধনের পূর্ব্বে রন্ধনশালার হাঁড়ি ও পাত্রাদি সুন্দররূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক; নতুবা পূর্ব্ব-দিনের সংলগ্ন দ্রব্যাদি পচিয়া পীড়াদায়ক হয়। মৃত্তিকা বা লৌহপাত্রের ব্যবহার অল্পব্যয়সাধ্য এবং ঐ পাত্র পরিষ্কৃত রাখিলে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তাম্র বা পিত্তলের রন্ধন বা ভোজন পাত্র তৈলাদি দ্রব্যের সংযোগে বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই গুলি উত্তমরূপে কলাই করা না থাকিলে ব্যবহার করা অনুচিত। দুগ্ধ, তৈল, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্য কাচের বা পাতরের পাত্রে রাখিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু পিত্তল কাঁসার পাত্রে রাখিলে দূষিত হয়। খাদ্য দ্রব্যে ঝুল, বালি, কীট, মক্ষিকা প্রভৃতি পড়িলে উহা অখাদ্য হইয়া উঠে, এজন্য উহা ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। রন্ধনের পূর্ব্বে তরকারী, চাউল, ডাল ভাল করিয়া পরিষ্কৃত না করিলে দোষ জন্মে। পান করিবার জল ঢাকিয়া না রাখিলে তাহাতে ধূলা কীট প্রভৃতি পড়িয়া তাহাকে দূষিত করিবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় অধ্যায়

পানীয়।

জল।

জলের প্রয়োজনীয়তা। মনুষ্য শরীর যে যে উপাদানে নির্ম্মিত তন্মধ্যে জলের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শরীর পোষণ করে, তাহার অন্যূন ৪/৫ ভাগ বিশুদ্ধ জলমাত্র। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, আমাদের সমুদয় শরীরের [illegible] ভাগ জলময়।

জল শরীর-পোষণ কার্য্যে সহায়তা করে। ভুক্ত কঠিন দ্রব্য জলে ভিজিয়া বা দ্রব হইয়া জীর্ণ হয়। রক্তস্থ জল দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পুষ্টিকর পদার্থ নীত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ চালিত হইয়া পরিণামে ফুস্‌ফুস্, ত্বক্ বা মূত্রযন্ত্র দিয়া বহিষ্কৃত হইয়া যায়। শরীরে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তাহাতেও যে জলের প্রয়োজন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের ত্বক্, ফুস্‌ফুস ও মূত্রযন্ত্রের কার্য্য দ্বারা নিরত শরীর হইতে জল বহির্গত হইতেছে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়; এজন্য তখন অধিক মাত্রায় জল পান করিতে হয়। আমরা স্নান করিলে ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া

শরীরে জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পিপাসা নিবারিত হয়।

আমরা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করি, তৎসমুদয় জল মিশ্রিত হইয়া কোমল না হইলে তাহাদের পরিপাক হয় না। এবং পরি-পাকের পর খাদ্য জলে দ্রব না হইলে শোষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে পরিপাক ও শোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে।

শরীরে যে পরিমাণে জল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কোন কারণবশতঃ তাহার অল্পতা হইলে আমাদের পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা জল পান করি। জলপান করিলে পিপাসা নিবারিত হয়, তদনন্তর শারীরিক কার্য্য অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে। পিপাসাকালে জল না পাইলে যে ভয়ানক ক্লেশ হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফলতঃ অনাহারে ১০।১৫ দিন জীবিত থাকা যায়; কিন্তু জল পান না করিলে ৩।৪।৫ দিনের মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে। জ্বর বা ওলাউঠা হইলে পিপাসায় মুখ, জিহ্বা প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায় ও পুনঃপুনঃ পান করিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না। জল জীবনধারণের একটী প্রধান সাধন, এজন্য জলের অপর একটী নাম জীবন।

পিপাসা হইলে জল পান করা উচিত। যে পরিমাণে পান করিলে পিপাসা শান্তি হয়, তাহার অধিক খাইলে সচরাচর অতিরিক্ত জলীয় ভাগ অতি শীঘ্র ঘর্ম্ম ও মূত্ররূপে বহির্গত হইয়া যায়। ক্ষুধার সময় যেমন ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে ক্ষুধাশান্তি হইল কি না, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়, সেইরূপ পিপাসার সময় ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া জল খাইলে

পিপাসা নিবারণ হইল কি না, অনায়াসে তাহায় উপলব্ধি হয়। জল আমাশয়সংলগ্ন নাড়ীবিশেষ দ্বারা শোষিত হইয়া সত্বরেই শরীরের কার্য্যে লাগে।

যখন পরিশ্রম করিতে করিতে ঘর্ম্মনিঃসরণ হয়, তৎকালে শীতল জল পান করা অবৈধ। ঘর্ম্মনিঃসরণকালে ত্বগভিমুখে রক্তের গতি হয়। শীতল জল পান করিলে সহসা সেই গতির ব্যাঘাত জন্মে; ঐ ব্যাঘাতবশতঃ ত্বগভিমুখরক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ বা পাকযন্ত্রে গমন করিয়া পীড়া উৎপাদন করে।

আহারের সময় বা অব্যবহিত পরেই অধিক জল খাইলে পাচক রস সকল জলসংযোগে নিস্তেজ হইয়া যায়, এজন্য তাহাদের দ্বারা সুন্দররূপে পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না।

বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ। আমরা যে জল ব্যবহার করি, তাহা বৃষ্টির জল মাত্র। নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল মেঘজাত। সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া মেঘ হয়, মেঘ হইতে বিশুদ্ধ বারি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উহা হয়ত প্রকাশ্যরূপে জলাশয়ে উপস্থিত হয়, অথবা প্রচ্ছন্নভাবে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং স্তরবিশেষ দিয়া প্রস্রবণাদিরূপে বহির্গত হয়।

বৃষ্টির জল অতি নির্ম্মল। ঊর্দ্ধ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার সময় উহাতে বায়ু মিশ্রিত হয়, তাহাতে উহার স্বাদ বৃদ্ধি হয়। বায়ুতে ধূলা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ উড্ডীয়মান থাকে, সে গুলি বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া উহাকে কিয়ৎ পরিমাণে অপরিষ্কৃত করে, কিন্তু যে সময়ে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হয়, সে সময়ে, বায়ু প্রায় পরিষ্কার থাকে। ঐ কালে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল। জল মৃত্তিকার উপর পড়িলে নানা পদার্থের সংযোগে

দূষিত হয়, এজন্য বৃষ্টির জল মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা উচিত। যে গ্রামে ভাল জল দুষ্প্রাপ্য, তথায় বড় জালায় অথবা পাকা চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল রাখিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। পরিষ্কৃত স্থানে চারিদিকে চারিটী বাঁশের খুঁটী পুতিয়া তাহার উপর একখণ্ড পরিষ্কৃত বড় চাদর বিছাইয়া চাদরের মধ্য-স্থানে একখণ্ড ইষ্টক বা প্রস্তর রাখিয়া দিতে হয়। চাদরের উপর যে জল পড়ে তাহা চতুর্দ্দিগ হইতে আসিয়া ঠিক মধ্য স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থানের নীচে একটী পরিষ্কৃত গামলা বা ঘড়া রাখিলে তাহাতে জল সঞ্চিত হয়। ভিনিস, কনষ্টাণ্টাই-নোপল প্রভৃতি স্থানের লোকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া তাহাই পান করিয়া থাকে।

এদেশে নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী ও কূপ হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়। বৃষ্টির জল ভূতলে পতিত হইলে লবণ, গলিত উদ্ভিদ ও জীব শরীরের অংশ এবং কর্দ্দম প্রভৃতির সংযোগে অপরিষ্কৃত বা দূষিত হয়, সুতরাং ঐ জল গড়াইয়া নদী, বিল, কূপ বা পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইলেও তাহা দোষবিহীন হয় না। কতিপয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিলে কূপাদির জল আমাদের পানের উপযোগী ও স্বাস্থ্য-প্রদ হইতে পারে। ক্রমে ঐ নিয়ম-গুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

নদীর জল। যে প্রদেশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, সেই প্রদেশের ভূমির রাসায়নিক প্রকৃতি ও সমুদ্র হইতে দূরতা অনু-সারে নদীর জলের উপাদানের ভেদ হইয়া থাকে। পাহাড়িয়া নদী প্রস্তরময় ভূমি দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহার জল প্রায়ই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু নিম্ন বঙ্গদেশের নদী সকল পললময়

ভূভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে তাহার নানাবিধ উপাদান গ্রহণ করিয়া দূষিত হইয়া পড়ে। সমুদ্রের জল লবণমিশ্রিত, সুতরাং যে নদীতে জোয়ারের সময় সমুদ্র হইতে জল প্রবেশ করে, তাহার জল লবণাক্ত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে নদীর জল কর্দ্দমাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া অপরিষ্কৃত হয়; কিন্তু ঐ জল আনিয়া কিছুকাল গৃহে রাখিয়া দিলে ভাসমান কর্দ্দম, জলপাত্রের তলায় পড়িয়া যায়, তখন উপরের পরিষ্কৃত জল পান করা যাইতে পারে। কূপ বা প্রস্রবণে যে জল সঞ্চিত হয়, তাহা অনেক সময়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া দূর হইতে আসিবার কালে নানাবিধ খনিজ পদার্থ যোগে বিস্বাদ বা দূষিত হয়; কিন্তু নদীর জল ভূমির উপরিভাগ দিয়া প্রবাহিত; উহাতে স্রোত আছে বলিয়া রৌদ্র ও বায়ু অব্যাহতরূপে কার্য্যকারী হয় এবং উহাব ভাসমান পদার্থ তলায় পড়িয়া যায়; সুতরাং উহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

এদেশের অনেক নদী বর্ষাকালে প্রবল হয়, কিন্তু অন্যান্য সময়ে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা বিলের ন্যায় স্রোতোবিহীন হইয়া থাকে; তখন উহার জলে উদ্ভিদ প্রভৃতি জন্মিতে পারে, এবং কোন প্রকার মলা সংযুক্ত হইলে তাহা পচিয়া অনিষ্টকারী হয়। সচরাচর দেখা যায় যে, এ দেশের লোকের অনবধানতা বশতঃ নদী বা হ্রদের জল দূষিত হয়। নদী, বিল, বাঁওড়, পুষ্করিণী প্রভৃতির তীরে বা জলে মলমূত্র ত্যাগ ও মৃত মনুষ্য বা পশুর দেহ নিক্ষেপ করিয়া, কাপড় বিছানা বাসন ধৌত করিয়া এবং বাঁশ পাট শণ প্রভৃতি পচাইয়া লোকে উহা বিষবৎ করিয়া তোলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের সমুদায় বিষ্ঠা-রাশি, শব ও মৃত পশ্বাদি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত হইত, কিন্তু এক্ষণে ঐ

কুপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের অনেক লোকে এখনও ঈদৃশ ব্যবহার হইতে বিরত নহেন। পশ্বাদির স্নানকালেও তাহাদের মলমূত্র নদী বা পুষ্করিণীর জলে মিশ্রিত হইয়া জল দূষিত করে। বাস্তবিক কোন কোন পুষ্করিণীর ও ক্ষুদ্র নদী বা বিলের জল গ্রীষ্মকালে নিতান্ত দূষিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোক-দিগকে নানাবিধ ক্লেশ দেয়। কূপ ও পুষ্করিণীর অনতিদূরে কুয়া-পায়খানা থাকিলে বৃষ্টিদ্বারা ঐ পায়খানা ধৌত হইয়া তাহার ময়লা কূপ ও পুষ্করিণীর জলে মিশ্রিত হয়। বিষময় জল পান করিয়া যে অনেকে ওলাউঠা, রক্তাতিসার, উদরাময় ও টাইফইড্ জ্বর প্রভৃতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

কূপাদির জল। পুষ্করিণী ও কূপে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়, এতদ্ভিন্ন সন্নিহিত ভূমির ভিতর দিয়া জল আসিয়া উহাতে মিলিত হয়। শেষোক্ত প্রকার জল হয়ত নিকটবর্ত্তী নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে আইসে, অথবা মৃত্তিকার নীচে স্তরবিশেষের সঞ্চিত বৃষ্টির জল মাত্র। এই সঞ্চিত জল কখন বা ভূপৃষ্ঠ হইতে অদূরবর্ত্তী ও কখন বা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী থাকে। ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে এই দূরতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এদেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দূরতার চরম বৃদ্ধি ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে চরম হ্রাস দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় এই দূরতা গ্রীষ্মকালে ১৪ ফুট থাকে, বর্ষাকালে ইহা কমিয়া ৩ ফুট হয়।

যে ভূমির ভিতর দিয়া পুষ্করিণী ও কূপে জল আইসে তাহা বালুকাময় হইলে জল সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয়। বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা থাকে বটে, কিন্তু নদী হইতে তৎসন্নিহিত কূপাদিতে মৃত্তিকাভেদ করিয়া যে জল প্রবেশ করে সচরাচর

তাহা অতি নির্ম্মল। যেমন বালুকাস্তরে জল বিশোধিত ও পরিষ্কৃত হয়, তেমনি আবার যে স্তরে গলিত উদ্ভিদ বা জীব-শরীর ও মলমূত্র থাকে, তাহা দিয়া আসিলে, জলে নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ সম্মিলিত হইয়া উহাকে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তোলে।

পুষ্করিণীর জল। বৃষ্টির জল ভূতলে পতিত হইলে তাহার কিয়দংশ ভূমির উপর দিয়া গড়াইয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হয়, কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায় ও অবশিষ্টাংশ ভূমিতে শোষিত হয়। মৃত্তিকার উপর দিয়া গড়াইবার কালে জল ভূমির নানাবিধ ময়লার সহিত সংযুক্ত হইয়া অনিষ্টকর হয়। এই জল পুষ্করিণী ও কূপে কোন মতে পড়িতে দেওয়া অনুচিত। যে ভূমির জল গড়াইয়া পুষ্করিণীতে পড়ে তাহা বিশেষ পরিষ্কার রাখা উচিত। কোন অপরিষ্কার নর্দ্দামার সহিত পুষ্করিণীর যোগ রাখা বিধেয় নহে। যেখানে পুষ্করিণীতে নদী হইতে জল আনা আবশ্যক হয়, সে স্থলে মৃত্তিকার ভিতর দিয়া লৌহ-নলের প্রণালী রাখিলে উক্তরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না।

নানা কারণে পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়। লোকে উহাতে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, আবর্জ্জনা ফেলে এবং মলমূত্রত্যাগ ও শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করে। গবাদি জলে পড়ে ও তাহাতে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে। বৃক্ষের পত্রাদি জলে পড়িয়া পচিয়া উঠে। মাছ ধরিবার জন্য লোকে জলে পালা ফেলে। পাট, শণ প্রভৃতি পচাইয়া থাকে। বর্ষাকালে চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি হইতে জল গড়াইয়া পুষ্করিণীতে পড়ে ও তৎসঙ্গে মনুষ্য পশ্বাদির মলমূত্র ও মৃত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ আসিয়া পুষ্করিণীর জলের

সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পুষ্করিণীর জল বিষ-তুল্য হইয়া উঠে।

পুষ্করিণী এরূপ গভীর করা আবশ্যক যে, তাহা বৃষ্টির জলে পূর্ণ হইলে বারমাস ব্যবহার করিলেও শুষ্ক হইবে না। উহার পাহাড় উচ্চ রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে সন্নিহিত প্রদেশের ময়লা ধোয়ানিজল পুষ্করিণীতে আসিতে পারে না। পুষ্করিণীর পাহাড় ঘিরিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে গবাদি দ্বারা উহার জল অপরিষ্কৃত হইবে না। পাহাড়ের উপর বৃক্ষাদি থাকিলে ছেদন করা উচিত; কারণ বৃক্ষের পত্রাদি জলে পচিয়া ইহাকে দূষিত করে। সাবধান, ধোপারা কাপড় কাচিয়া যেন জল দূষিত না করে এবং বাঁশ, পাট প্রভৃতি জলে পচান না হয়। পদ্ম, শালুক, রক্তকম্বল, পাটা শেওলা প্রভৃতির পত্রে পুষ্করিণীর জল পরিষ্কৃত রাখে। ঐ গুলি হইতে অম্লজনক বাষ্প নির্গত হয়, তাহার শক্তিতে জল বিশোধিত হয়। জলে কোন পচা জিনিষ মিশ্রিত হইলে ঐ অম্লজনক সংযোগে তাহা দোষবিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত লতাদি মরিয়া গেলে জল হইতে উঠাইয়া দূরে ফেলা উচিত। জলে থাকিলে সে গুলি পচিয়া উঠিয়া জল দূষিত করিয়া ফেলে। পানা প্রভৃতি উদ্ভিদ অনিষ্ট-কারী, কারণ ঐ গুলিতে এক প্রকার উগ্রকটু পদার্থ আছে। যদি জলে কোন অনিষ্টকারী উদ্ভিদ বা পানা জন্মে, তাহা হইলে জল ও পানা প্রভৃতি উঠাইয়া পুষ্করিণী হইতে দূরে ফেলিবে ও পঙ্কোদ্ধার করিবে।

পুষ্করিণীর নিকট পায়খানা নির্ম্মাণ করিবে না এবং পুষ্করিণীর ধারে বা জলে কাহাকেও মলত্যাগ বা শৌচ, প্রস্রাবাদি করিতে দিবে না। পান ও রন্ধনের জলের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী নির্দ্দিষ্ট

করিয়া রাখা আবশ্যক। এরূপ পুষ্করিণীতে কখন স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে দিবে না। জল লইবার কালে কাহাকেও জলে নামিতে দিবে না। কাঠের বা ইটের এরূপ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিবে, যাহার উপর বসিয়া লোকে অনায়াসে জল তুলিতে পারে। অপরিষ্কার পাত্রে কাহাকেও জল তুলিতে দিবে না। কয়েক বৎসর ব্যবহারের পর যখন পুষ্করিণীর জল অপরিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা বোধ হইবে তখন জল উঠাইয়া ফেলিবে ও পঙ্কোদ্ধার করিবে। উদ্ধৃত পঙ্কে ভাল সার হয়। উহা ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে। কদাচ পুষ্করিণীর ধারে ফেলিবে না। মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার না করিলে পুকুরে যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা পাঁকের সংযোগে অপরিষ্কৃত হয় এবং নিম্ন-দিক হইতে বালুকাস্তরের জল পাঁক ভেদ করিয়া উঠিত পারে না; তাহাতে জলরাশি ক্রমে কমিয়া যায়।

কূপের জল। ভাল পুষ্করিণী খনন করা ব্যয়সাধ্য, এজন্য কখন কখন কূপের জল পান করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কূপের গভীরতা ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির রাসায়নিক প্রকৃতির উপর উহার জলের দোষগুণ নির্ভর করে। অগভীর কূপের জল ভাল না হইবার প্রধান কারণ এই যে, উহাতে পার্শ্বস্থ ভূভাগের ধোয়ানিজল আসিয়া মিশ্রিত হয়।

নিম্ন বঙ্গদেশের ভূমি পললময়, তাহাতে কূপ খনন করিলে অনেক সময়ে কূপের জলে চূণ, সোডা, ম্যাগ্নিসিয়া এবং মৃত জীব ও উদ্ভিদ শরীরের পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উহাকে দূষিত ও পানের অযোগ্য করে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি জেলার লৌহমিশ্রিত লালমাটীতে, অথবা গয়া, মুঙ্গের, হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার প্রস্তরময়

মাটীতে কূপ খনন করিলে নির্ম্মল পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ভূমিতে কাঁকর ও ঘুটিং আছে তাহাতে কূপ খনন করিলে সকল সময় উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায় না। কারণ উক্ত জলে চূণ, সোডা প্রভৃতির লবণ থাকিয়া জল বোদা করিয়া ফেলে। কূপের ন্যায় প্রস্রবণের জল কখন পরিষ্কৃত কখন বা অপরিষ্কৃত হয়। কোন কোন প্রস্রবণের জলে গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে রোগবিশেষে উপকারী হয়।

বৈশাখ মাসে গভীর করিয়া কূপ খনন করিবে এবং কূপের তলায় বালুকা ও কয়লা স্থাপন করিবে। পায়খানা বা রন্ধনশালার নিকটে কূপ খনন করিবে না। কূপের তিন হাত রাখা আবশ্যক। জমি হইতে অন্যূন নিম্ন পর্য্যন্ত ঘুটীং চূণ দিয়া পাকা করিয়া কূপের বেষ্টন নির্ম্মাণ করিবে। যদি একান্তই ইষ্টক নির্ম্মিত বেড় প্রস্তুত করা না হয়, তাহা হইলে উত্তম আটালিয়া মাটী বা কাঁকর দিয়া ৮।১০ ফুট গভীর করিয়া কূপ বাঁধাইবে। তাহা হইলে উহাতে ভূমির ধোয়ানিজল প্রবেশ করিতে পারিবে না। বেষ্টনী ভূমি হইতে তিন ফুট উচ্চ করিয়া গাঁথিবে ও তাহার মুখে কাষ্ঠ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। তাহা হইলে তৃণ পত্র অথবা কোন ক্ষুদ্র প্রাণী জলে পড়িয়া পচিতে পারিবে না। বায়ু গমনাগমনের জন্য ঢাকনীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা উচিত। কূপের সন্নিকটে কাহাকেও বাসন মাজিতে, মুখ ধুইতে, কাপড় কাচিতে, স্নান করিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিতে অথবা আবর্জ্জনা বা গোময় ফেলিতে দিবে না। অপরিষ্কার পাত্রে কাহাকেও কূপের জল তুলিতে দিবে না। কূপের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি বাহিরের দিকে ঢালু করিয়া

কাঁকর দিয়া নির্ম্মাণ করিবে। তাহা হইলে [illegible] [illegible] যে কিছু মলিন জল পড়িবে তাহা দূরে চালিত হইয়া যাইবে।

এদেশের অনেক গৃহস্থের বাটীতে সামান্য অগভীর কূপ দৃষ্ট হয়। বাটীর মূত্র, অপরিষ্কৃত জল ও রন্ধনশালার জলীয় পদার্থরাশি বৃষ্টির জলের সহিত কূপে গিয়া পড়ে, অথবা ভূমি ভেদ করিয়া কূপের জলের সহিত মিশ্রিত হয়। কখন কখন ভূমির ভিতর দিয়া কূয়া পায়খানার মলরাশির কিয়দংশ উক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয়। ঈদৃশ দূষিত জল উদরস্থ করিলে পীড়া জন্মে।

অনেকে কূপের সন্নিহিত ভূমিতে স্নান ও গাত্র মার্জ্জনাদি করে। কখনও বা পশ্বাদির ব্যবহার জন্য কূপের নিকট ইষ্টক নির্ম্মিত চৌবাচ্চা রাখে। ঈদৃশ অপরিষ্কৃত জল কূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলে অনিষ্ট হয়। বালুকাময় নদীর গর্ভে কূপ খনন করিলে যে জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশোধিত জলের ন্যায় পরিষ্কৃত। পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাস্তর দিয়া আসিবার কালে উহার মলা বালুকাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর পার্শ্বেও ঈদৃশ কূপ খনন করিলে উত্তম জল পাওয়া যায়। পুরী নগর সন্নিহিত সমুদ্র তটে যে সকল কূপ আছে, তাহার জল লবণময় নহে। উহা অতি সুস্বাদ। হয় বালুকাস্তর ভেদ করিয়া আগমন কালে সমুদ্র জলের লবণত্ব দূরীকৃত হইয়াছে, নতুবা ঐ জল অদূরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডের অভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত। আর্টিসীয় কূপ খনন করিতে পারিলে নিম্ন ভূস্তর হইতে বিশুদ্ধ বারি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দূষিত জল। পানীয় জলের প্রকৃতি ভেদে নানা রোগ জন্মে; যে জলে চূণ ও ম্যাগনিসিয়ার লবণ মিশ্রিত থাকে, তাহা দীর্ঘকাল পান করিলে অনেকে গলগণ্ড রোগগ্রস্ত হয়। এই রোগ রঙ্গপুর হইতে গোরখপুর পর্য্যন্ত তরাই প্রদেশে সচরাচর

দুষ্ট হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন কোন স্থানে পাতরি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া চিকিৎসকেরা মনে করেন যে চূণের অংশ মিশ্রিত জল পান করিয়া তত্তৎস্থানের লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। যদি পানীয় জলে আবর্জ্জনা, গলিত মল ও জীব-শরীর মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে উদরাময় ও ওলাউঠা রোগ হইবার সম্ভাবনা। লবণাম্বু নদীর জল পান করিলে লোকে উদরাময় রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। পশ্চিমের লোক কলিকাতার নিকট কিছুকাল বাস করিলে এই রোগে আক্রান্ত হয়, তখন কহে লোণা লাগিয়াছে।

কলিকাতার জলের কল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরে অতিশয় জল কষ্ট ছিল। মলমূত্র ও গলিত শবাদি সম্মিলিত গঙ্গাজল অথবা পূতিগন্ধবিশিষ্ট পুষ্করিণীর জল পান করিয়া তৎকালে বহুসংখ্যক লোক উদরাময় রোগাক্রান্ত হইত। প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া দূরবর্ত্তী উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী হইতে জল আনাইয়া কথঞ্চিৎ পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদের দুঃখ ও রোগের পরিসীমা ছিলনা। মফঃস্বলবাসীরা তৎকালে কলিকাতাকে যমের বাড়ী জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিক তখন তথায় কিছুদিন বাস করিলে রোগ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

কলিকাতা এতদ্দেশের রাজধানী এবং তথায় এক্ষণে প্রায় আট লক্ষ লোকের বাস। যে কোন উপায়েই হউক উহাকে স্বাস্থ্যকর করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন নগরের মিউনিসি-প্যাল কমিশনরগণ অনেক চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়রের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দূর হইতে বিশুদ্ধ বারি আনিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বারাকপুরের সন্নিহিত কলিকাতা হইতে প্রায় পনের

মাইল দূরবর্ত্তী পলতা নামক স্থানে গঙ্গা হইতে জল উঠাইবার কল বসাইলেন, এবং উহা বিশোধন করিবার জন্য তথায় কয়েকটী হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বালি ও কয়লার ফিল্টার স্থাপন করিলেন। ভূমির অভ্যন্তরে লোহার সুবৃহৎ নল সন্নিবেশ করিয়া তদ্দ্বারা জল আনিতে লাগিলেন এবং উহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রতি রাজবর্ত্মে ও প্রতি গৃহে জল প্রদানের সুন্দর উপায় করিয়া দিলেন।

প্রথমে অনেকে মনে করিয়াছিলেন কলের জল সুস্বাদ বা স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে না, কিন্তু কিছুদিন ব্যবহার করিবার পরে সকলেরই এই ভ্রম দূরীকৃত হইল। কিয়ৎকালের মধ্যে ডাক্তারেরা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে, উদরাময় প্রভৃতি রোগের অনেক হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে কলিকাতা, সন্নিহিত পল্লীসমূহ অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইতেছে বলিয়া সাধারণের সংস্কার জন্মিল। এক্ষণে পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা কলিকাতায় আসিতে আর কিছুমাত্র ভয় করেন না।

এক্ষণেও কলিকাতায় কোন কোন পল্লীর পুষ্করিণীর সহিত পয়ঃপ্রণালী ও পায়খানার যোগ আছে। ঐ সকল জলাশয়ের জল বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। এই গুলি যাহাতে ক্রমে মৃত্তিকা দ্বারা বুজাইয়া দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা অতি সমৃদ্ধ স্থান। উহার বহুব্যয়সাধ্য জলবিশোধনপ্রণালী সামান্য পল্লীগ্রামে প্রচলিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কয়েক বৎসর হইল ঢাকা নগরে জলের কল সংস্থাপিত হইয়াছে। এই জলের কল হইবার পূর্ব্বে ঢাকাতে ভয়ানক ওলাউঠা ও উদরাময় রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং অনেক লোক

এই দুই রোগে মারা পড়িত। এক্ষণে শুনা যায় ঢাকা নগরে এই সকল রোগের আর তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। সম্প্রতি কতিপয় সমৃদ্ধ দেশহিতৈষী ব্যক্তির যত্নে ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি নগরেও জলের কল স্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতা ও ঢাকার বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহের কল দেখিয়া নির্ম্মল জল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা অনেকেই অনুভব করিতে পারিবেন। এ বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে রন্ধন ও পানের জন্য বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করা কতদূর অন্যায় তাহাও বোধগম্য হইবে।

জল বিশোধন। কোন গ্রামে নদী, পুষ্করিণী, বিল বা কূপের বিশুদ্ধ জল না থাকিলে উপায়বিশেষ দ্বারা উহা শোধন করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে নদীর ঘোলা জলে ফট্‌কিরি চূর্ণ দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে উহা পরিষ্কৃত হইতে পারে। উপরের পরিষ্কৃত জল ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া, নীচের ময়লা জল ফেলিয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থানে নির্ম্মলফল জলে দিয়া জলশোধন করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা ফট্‌কিরির ন্যায় সত্বর কার্য্যকারী নহে। দূষিত জল অধিকক্ষণ জ্বাল দিয়া ফুটাইলেও উহার কোন কোন দূষিত উপাদান পাত্রের তলায় পড়ে ও কোন কোনটী বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কখন কখন লৌহফলক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া জলের মধ্যে ডুবাইলেও কিয়ৎ পরিমাণে জলশোধন হয়। বাজারে অঙ্গার নির্ম্মিত যে সকল ফিল্টার বিক্রয় হয়, তাহার ভিতর দিয়া জল চালিত হইলেও প্রায় বিশুদ্ধ হইয়া উঠে; কিন্তু কিয়দ্দিন জলবিশোধনের পর ফিল্টার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তখন পুনরায় উহার অঙ্গার পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

এদেশে এক প্রকার "বেলে পাথর" দৃষ্ট হয়, উহার নির্ম্মিত ফিল্টার দ্বারাও জল শোধন হইতে পারে। সহসা দেখিলে
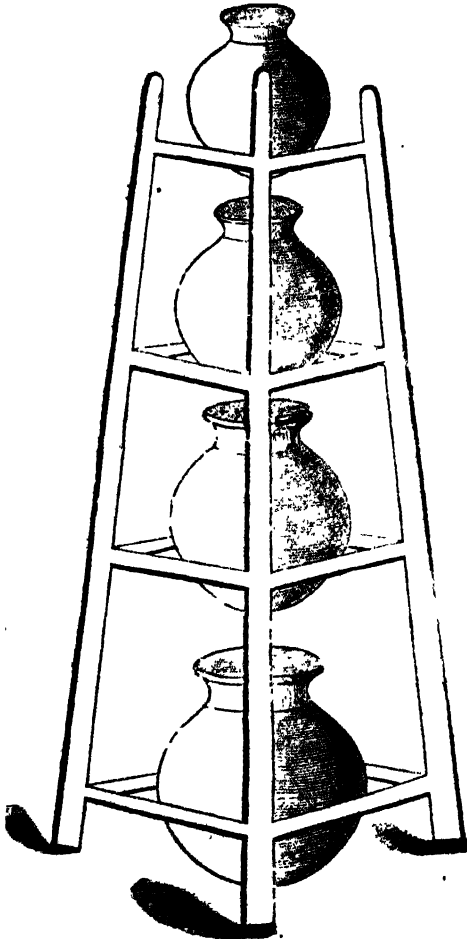
উহাতে কোন ছিদ্র লক্ষিত হয় না, কিন্তু উহাতে জল দিলে কিছুকাল পরে চুয়াইয়া পড়ে।

বকযন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া লইলে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহাতে বায়ু মিশ্রিত থাকে না, সুতরাং উহার স্বাদ ভাল নহে। কখন কখন সমুদ্রপথে গমনকালে অন্তবিধ পানীয় জল নিঃশেষিত হইয়া গেলে জাহাজের অধ্যক্ষেরা সমুদ্রজল চুয়াইয়া আরোহীদিগকে পান করিতে দিয়া থাকেন। চুয়ান জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে। নিম্নে জলশোধনের যে উপায় প্রদর্শিত হইতেছে, উহা ব্যয়সাধ্য নহে এবং উহাতে যে পরিমাণে জল পাওয়া যায়, তাহাতে সামান্য গৃহস্থের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।

উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী একটী বাঁশের বা কাঠের ফ্রেমের উপর যথাক্রমে স্থাপিত করিতে হয়। উহার প্রতিরূপ পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইল। প্রথমতঃ জল উত্তপ্ত করিয়া ফুটাইবে, পরে উপরের কলসীতে ঢালিবে; উহার নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া জল ক্রমশঃ ২য় কলসীতে পড়ে। ২য় ও ৩য় কলসী অঙ্গারচূর্ণ ও বালুকাতে পরিপূর্ণ ও উহার তলায় ছিদ্র আছে। সকলের নীচের কলসীর মুখে মোটা কাপড়ের আবরণ রাখিতে হয়। ২য় ও ৩য় কলসী দিয়া গমন কালে জলের দূষিত অংশ অঙ্গার ও বালুকাদ্বারা নষ্ট বা আকৃষ্ট হয়, সুতরাং সকলের নীচের কলসীতে যে জল উপনীত হয়, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ। উহার স্বাদও সামান্য উষ্ণ জলের স্বাদের ন্যায় অপকৃষ্ট নহে। বিশোধন করিবার সময়ে উহাতে বাহিরের বায়ু পুনঃপ্রবেশ করে, তাহাতে উহার স্বাভাবিক স্বাদ উৎপন্ন হয়। কলসীর অঙ্গার ও বালুকা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

জল পরীক্ষা। জল ব্যবহারোপযোগী কি না তাহা নির্ণয় করিয়া পরে ব্যবহার করা উচিত। যে জলের স্বাদ, গন্ধ,

ও বর্ণ বিকৃত কিংবা যাহাতে কোন কীট বা অন্য পদার্থ ভাসমান থাকে, সে জল বিশোধন না করিয়া কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন যে জলাশয়ে মলমূত্র বা আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয় বা মনুষ্যপশ্বাদি স্নান করে, তাহার জল কদাচ ব্যবহার করিবে না। যৎকালে জ্বর, ওলাউঠা বা অন্যবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হয়, তখন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া রন্ধন ও পানের জল মনোনীত করিবে। এ বিষয়ে ঔদাস্য করিলে সপরিবারে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা।

চা, কাফী প্রভৃতি পানীয়। চা, কাফী বা তাদৃশ অন্য কোন পানীয় অনেক সভ্য জাতির মধ্যে ব্যবহৃত। ইহাতে আপাততঃ বোধ হয়, যেন এই গুলির দ্বারা আমাদের শরীরের কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কত ব্যক্তি এই সকল পানীয় গ্রহণ না করিয়াও উন্নত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু সময় বিশেষে এই গুলি অতি সুখপ্রদ। যৎকালে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া বা চিন্তাকুল হইয়া লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন চা বা কাফী পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই গুলি অধিক মাত্রায় উদরস্থ করিলে পাকযন্ত্র বিকৃত হয়, এবং অম্লের পীড়া, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগ জন্মে।

চা ও কাফী পান করিলে নিদ্রার পরিমাণ হ্রাস হয়। চা অপেক্ষা কাফীর এই গুণ অধিক। কখন কখন ছাত্রেরা চা ও কাফী পান করতঃ রাত্রিজাগরণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করেন। বেশী দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে স্নায়ুযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন কোন চিকিৎসকের মত এই যে, প্রত্যূষে কাফী পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রমণ করিতে পারে না, অতএব

যাহাদের অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ কাফী পান ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সুরা। হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে সুরাপান নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। বাস্তবিক এদেশের অনেকে সুরা পান করেন না। নীচ জাতীয় হিন্দু ও সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার দেখা যায়। ইহাদের মধ্যেও যাহারা কোন উন্নত ধর্ম্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আর মদ্যপান করে না। মদ্য নানাবিধ। এদেশে তণ্ডুল, গুড়, মহুয়া প্রভৃতি হইতে উহা প্রস্তুত হয়। ইউরোপ হইতে যে সকল মদ্য আমদানি হয়, তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত। মদ্যে সুরাসার নামক পদার্থ যত বেশী থাকে উহার মাদকতাশক্তি তত বেশী হয়। কোন কোন মদ্যে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র সুরাসার থাকে। অন্যগুলিতে ১০ হইতে ২০। ২২ ভাগ আছে। ব্রাণ্ডি, জিন প্রভৃতিতে ৪০। ৪৫ ভাগ থাকে। শরীর পোষণের জন্য সুরার প্রয়োজন হয় না। সুরাপানে পরিশ্রমের শক্তির হ্রাস হয়, এবং অধিক শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। অধিক সুরাপান করিলে শারীরিক বৈকল্য উপস্থিত হয়, চৈতন্য রহিত হয় এবং কখন কখন সহসা জীবন শেষ হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলে যকৃৎ, হৃদয়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্র প্রপীড়িত হয়, কেহ কেহ বাত রোগে শয্যাগত হইয়া পড়ে। সুরাপায়ীরা পরিজনবর্গের ক্লেশের কারণ হয়। ইহাতে যে অর্থনাশ হয়, তাহা রাখিলে সংসারের অনেক উপকারে লাগে। অনেকে সুরার আশ্রয় লইয়া অন্নাভাবে ক্লেশ পায়, এবং কত কুক্রিয়া দ্বারা মানব নাম কলঙ্কিত করে। এদেশের ভদ্র লোকের মধ্যে এক্ষণে সুরার ব্যবহার

আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে কত লোকের নানা রোগ ও অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। চিকিৎসকেরা কোন কোন্ রোগে অল্প মাত্রায় ঔষধপথ্যের সহিত বা পৃথকরূপে মদ্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ অবস্থায় উহাতে মহোপকার হয়। অন্য সময়ে সুরা বিষের ন্যায় পরিহার্য্য।

অন্যান্য মাদক দ্রব্য। এদেশে সুরা ব্যতীত আরও নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা ও চরস প্রধান। এই কয়েকটীর যোগে নানা প্রকার মাদক প্রস্তুত হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা কোন কোন রোগে আফিং ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উহা নানা আকারে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে উহার গুলির ধূমপান সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ। আফিং ভয়ানক বিষ, কিয়ৎ পরিমাণে উদরস্থ হইলে জীবন নাশ হয়। সিদ্ধি ও গাঁজা এক জাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন। চরস উহার নির্য্যাস মাত্র, কিন্তু বঙ্গদেশে যে চরস ব্যবহার হয় তাহা ভিন্ন দেশ হইতে আমদানি হয় গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্প্রতি যে কমিশন বসিয়াছিল তাহাতে গাঁজা প্রভৃতির দোষগুণ অনুসন্ধান করা হয়। চরসের ব্যবহার তত বেশী নাই ও উহার দোষ অনেকে স্বীকার করেন। সিদ্ধির দোষ তত বেশী নহে, কিন্তু উহার বিলক্ষণ মাদকতা শক্তি আছে। গাঁজার ধূমপান করিয়া কোন কোন কুক্রিয়াসক্ত লোক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অনেকের সংস্কার এই যে উহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে উন্মাদ রোগ জন্মে কিন্তু এই বিশ্বাসটী সপ্রমাণ হয় নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন যে গাঁজা খাইয়া কোন কোন ব্যক্তির যে উন্মাদ রোগ জন্মে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাহা হউক ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা কোন কোন রোগে গাঁজার আরক

ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের কবিরাজেরা সিদ্ধিমিশ্রিত করিয়া কোন কোন ঔষধ প্রস্তুত করেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ইতর লোকদিগকে তাড়ি খাইতে দেখা যায়। সুরার ন্যায় তাড়িরও মাদকতা শক্তি আছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে অনেকে মদ্যের ন্যায় এ সমুদায়কে তত ঘৃণা করেন না।

এক্ষণে এদেশের অনেকে তামাক খাইয়া থাকেন। অধিক তামাক খাইলে নানা রোগ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহাদের কাসি প্রভৃতি রোগ আছে, তামাক তাহাদের পক্ষে ভাল নহে। ধূমপান অপেক্ষা নস্যগ্রহণ ও পানের সহিত অথবা শুধু মুখে তামাক চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া আরও অনিষ্টকর। উহাতে পাকযন্ত্র ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বায়ু

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা। খাদ্য বা পানীয় অভাবে কয়েক দিবস জীবন ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু বায়ুরোধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাহারা ডুবিয়া মরে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, বায়ুস্থ অম্লজনক বায়ুর সহিত শরীরের পরিত্যক্ত দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুর বিনিময় না হওয়াতেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। যে অঙ্গার দাহন করিয়া আমরা রন্ধনাদি করিয়া থাকি, তাহার সহিত বায়ুস্থ অম্লজনকের যোগে দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বায়ু

উৎপন্ন হয়। অম্লজনকের পরিবর্ত্তে ঐ বায়ু নিঃশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলে শ্বাসরোধ হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে দ্বাম্ল-অঙ্গারক বায়ুর অপকারিণী শক্তির উল্লেখ করা গেল, সেই বায়ু সতত আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হইতেছে। নিঃশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে, উহার অম্লজনক ভাগ ফুস্‌ফুসপথে শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তাহার বিনিময়ে শরীরস্থ দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ু, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অম্লজনক বায়ু সহকারে শরীরের অভ্যন্তরের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা কোন মতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারিলে অপকার হয়। নিঃশ্বাসরোধ হইলে অম্লজনক শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রথমতঃ সংজ্ঞাহরণ এবং ৫।৬ মিনিটের মধ্যে জীবন শেষ করিয়া ফেলে।

দূষিত বায়ু। ইউরোপের পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিশুদ্ধ বায়ুর ৫০৫০ ভাগের দুই ভাগ দ্বাম্ল-অঙ্গারক বায়ু; কিন্তু প্রশ্বাস দ্বারা ফুস্‌ফুস্ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার ১০০ ভাগে ৪।৫ ভাগ উক্ত বায়ু থাকে। অতএব প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করা উচিত নহে; পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলে অশেষবিধ ক্লেশ ও শেষে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। অতি সংকীর্ণ এক গৃহে বহুসংখ্যক লোককে রুদ্ধ রাখাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিল না। উহারা পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত বায়ু এবং শরীরনিঃসৃত অন্যান্য বাষ্প নিঃশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া যে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

জনাকীর্ণ স্থানের বায়ু পুনঃ পুনঃ সেবন করিলে, শিরঃপীড়া

ও মূর্চ্ছারোগে ক্লেশ পাইতে হয়। বোধ হয় অঙ্গারজারক বায়ু ও শরীরের পরিত্যক্ত নানাবিধ জান্তব পদার্থের আধিক্য এবং অম্লজনকের অল্পতাবশতঃ এইরূপ ঘটে। দূষিত বায়ু সেবনে যদিও সকল সময়ে শিরঃপীড়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি তাহাতে যে অনিষ্ট হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অধিক কাল ঐরূপ বায়ু সেবন করিলে সময় ক্রমে বর্ণ মলিন ও পাকযন্ত্র প্রপীড়িত হয়। শরীর এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে উদরাময়, ওলাউঠা, জ্বর প্রভৃতি রোগের বীজ উহাকে আশ্রয় করিতে পারে, ইহা এক্ষণে অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

দূষিত বায়ুসেবনে অন্যান্য যে যে রোগ জন্মে, তন্মধ্যে ক্ষয়কাস প্রধান। যৎকালে সৈনিক বা কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ অপ্রশস্ত স্থানে বাস করিতে বাধ্য হয়, অথবা বৃহৎ অবরুদ্ধ কারখানায় বহুসংখ্যক লোক প্রতিনিয়ত কর্ম্ম করিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকের এই রোগ হইয়া থাকে। অতএব যে স্থানে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হয় বা যে গৃহে অনেকে শয়ন করে, তাহাতে সুন্দররূপে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের উপায় রাখা আবশ্যক। ডাক্তার উইলসন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ৬০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলে, উচিত পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার কনিংহাম কহেন যে, ভারতবর্ষীয় কারাগার সমূহে প্রত্যেক কারাবাসীর জন্য ৬৪৮ ঘনফুট স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। মনে কর, কোন একটি গৃহ ১০ ফুট উচ্চ, তাহা হইলে গৃহে যতজন শয়ন করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ঘরের মেজের ৬০ বর্গফুট পরিমিত স্থান আবশ্যক। ইহা হইলে অন্ততঃ ৬০ × ১০ = ৬০০ ঘনফুট স্থান প্রত্যেকের জন্য নির্দ্ধারিত থাকে।

গৃহের বাহিরে সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে। এরূপ স্থানে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইলে কোন ক্ষতি নাই; কারণ প্রশ্বসিত অঙ্গারক বায়ু ইতস্ততঃ বায়ুরাশিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু গৃহমধ্যে বা আবৃত স্থানে অধিক লোক সমাগত হইলে নানা অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক বাসগৃহ সেরূপ কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহাতে বায়ুসঞ্চালনের উপায় নাই; হয়ত বায়ু প্রবেশের পথই থাকে না। একে গৃহাদি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার রাত্রিকালে অনেকে একগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহে হয়ত জানালা নাই, থাকিলেও তাহার সম্মুখে ক্রুজ্ জানালা না থাকাতে বায়ুর গমনাগমন হয় না। গ্রীষ্মকালে গবাক্ষাদি খোলা থাকে, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু শীতকালে তাহার কোন উপায় থাকে না। অভ্যাস দোষে এরূপ গৃহে বাস করিলে কোন উপস্থিত কষ্ট দেখা যায় না বটে কিন্তু তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয় ও নানা রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

কেবল মনুষ্যপশ্বাদির শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু দূষিত হয় এমত নহে। অন্যান্য কারণেও বায়ুর দোষ জন্মে। কাষ্ঠাদি দাহন কালে অঙ্গারক বাষ্প বায়ুরাশিতে মিলিত হয়। যে সকল উদ্ভিদ্ বা জীবশরীর অনুক্ষণ পচিয়া যাইতেছে তাহাতে নানাবিধ বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে সংযুক্ত হয়। জীবদিগের মলমূত্র ঘর্ম্মাদি প্রতিনিয়ত বায়ুতে মিলিয়া তাহার দোষ বৃদ্ধি করিতেছে। রন্ধন শালায় ও পশুশালায় পরিত্যক্ত সামগ্রীদ্বারাও বায়ুর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। চর্ম্মকার, কসাই প্রভৃতির কার্য্যদ্বারা বায়ুতে পূতিগন্ধময় পদার্থ মিশ্রিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শিল্পকরের কারখানায় গ্যাস ও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিরাশি বা অন্যবিধ

পদার্থের রেণু উড্ডীয়মান থাকিয়া তত্রত্য বায়ুর দোষ উৎপাদন করে। পাটের কল ও তুলা ধুনিবার কলে এত সূক্ষ্ম ধূলা প্রভৃতি ব্যাপ্ত থাকে যে, তাহাতে সময়ে ফুস্‌ফুসের রোগ জন্মিতে পারে।

পচা নর্দ্দামা, কূয়া পায়খানা প্রভৃতি স্থানের দূষিত বায়ু গ্রহণ করিলে ভেদ বমন প্রভৃতি রোগ জন্মে। এই রোগ কখন কখন ওলাউঠার ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। যাহারা সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট বায়ু সেবন করে, তাহারা কোন কারণবশতঃ কিছুকাল এইরূপ দূষিত বায়ু সেবন করিলে, এই সকল রোগে আক্রান্ত হয়; কিন্তু যাহারা অনুক্ষণ ঈদৃশ দূষিত বায়ু সেবন করিতেছে অথবা নর্দ্দামা ও পায়খানা পরিষ্কার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায় এই দূষিত বায়ু সেবন করিয়াও তাহারা বড় রোগাক্রান্ত হয় না। বাস্তবিক দীর্ঘকাল অভ্যাস হইলে মনুষ্য শরীরে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য হইয়া উঠে।

পায়খানার দূষিত বায়ু সেবন করিলে "টাইফইড" বা অন্ত্র-সম্বন্ধীয় জ্বর নামক ভয়ানক রোগ জন্মে, অনেক চিকিৎসক এরূপ মনে করেন। এই রোগ সচরাচর শীতপ্রধান দেশে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে উহা দেখা যাইতেছে। কলিকাতার ডাক্তারেরা পূর্ব্বে এই রোগ যে পরিমাণে দেখিতে পাইতেন, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক দেখিতে-ছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মৃত পশুশরীর হইতে অনেক দূষিত বাষ্প নির্গত হয় তৎ-পক্ষে কোন সংশয় নাই; কিন্তু গবাদি মরিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই শকুনি, শৃগাল প্রভৃতিতে তাহাদের মাংস উদরস্থ করিয়া ফেলে। মৃত পশ্বাদি প্রায় গ্রামের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়, তজ্জন্য গ্রামের বায়ু বড় দূষিত হইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন

জনাকীর্ণ মুসলমানের গ্রাম বা পল্লীর অভ্যন্তরে ও বাসগৃহের নিকটে সমাধিস্থান দৃষ্ট হয়। ইহাতে যে তত্রত্য বায়ু দূষিত হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সমাধিস্থানের সন্নিহিত গৃহাদিতে অধিক সংখ্যক লোক পীড়াগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। জলাভূমি হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা "ম্যালেরিয়া" নামে অভিহিত। সবিরামজ্বর ও অল্পবিরাম-জ্বর ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ম্যালেরিয়া, উদরাময়, রক্তামাশয়, স্নায়ুপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের কারণ, এরূপ অনেকে অনুমান করেন। জলাভূমির নিকটে যাহাদের বাস, তাহাদের কোন বিশেষ রোগ না থাকিলেও সচরাচর দেখা যায় যে তাহাদের বর্ণ মলিন ও উদরে বড় প্লীহা আছে।

বায়ু বিশোধন। যে সকল দূষিত পদার্থ বায়ুরাশিতে অনুক্ষণ মিলিত হইতেছে, তাহা দূরীকৃত না হইলে অল্পকাল মধ্যেই প্রাণনাশক হইয়া উঠিত। কিন্তু বায়ু বিশোধন করিবার কতিপয় নৈসর্গিক উপায় থাকাতে উহার অবস্থা সচরাচর মন্দ থাকে না। (১) বায়ুস্থিত বায়বীয় পদার্থগুলি স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ব্যাপ্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। যে বিষাক্ত পদার্থ ক্ষুদ্র গৃহের বায়ুকে দূষিত করে, তাহা বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইলে নিস্তেজ হইবার সম্ভাবনা। (২) উদ্ভিদসমূহের পত্রে বায়ুস্থিত অঙ্গারক বাষ্প বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। উহার অঙ্গার ভাগ উদ্ভিজ্জে সংযুক্ত হয় এবং অম্লজনক ভাগ বায়ুতে মিশ্রিত হয়। বাস্তবিক ভূমণ্ডলে উদ্ভিদসমূহ দ্বারা প্রতিনিয়ত যে মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন জনাকীর্ণ স্থানে বৃক্ষশ্রেণীর অভাব হইলে বায়ু সংশোধন কার্য্যেরও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাঘাত হয়। এক্ষণে অনেক নগরে এবং

রাজবর্ত্মে এই জন্য তরুশ্রেণী রোপিত হইতেছে। (৩) সূর্য্যা-তপ ও তাড়িত প্রভাবে গলিত পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে এবং অম্লজনক বায়ু "ওজোন" বা গন্ধাম্লজনকে পরিণত হইয়া জগতের পূতিগন্ধ ও দূষিত পদার্থাদি বিনষ্ট করে। (৪) বায়ুপ্রভাবে ও ঝটিকা বা ঝঞ্ঝাবাতপ্রভাবে এক স্থানের দূষিত বায়ু বহুদূর বিক্ষিপ্ত হইয়া দোষবিহীন হইয়া পড়ে। (৫) বৃষ্টিকালে বায়ু ধৌত হয়, সুতরাং উহাতে যে ধূলি-কণা ও অন্যান্য সূক্ষ্ম ও দূষিত পদার্থ উড্ডীয়মান থাকে তাহা বৃষ্টির জল সহকারে ভূমিতে পতিত হয়। কলিকাতা প্রভৃতি বৃহৎ নগরের বায়ু বর্ষাকালে এই প্রকারে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। ফলতঃ বায়ুতে যত বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হউক না কেন, যে সকল উপায় বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা কালক্রমে উহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যখন যে স্থানের বায়ুতে দূষিত পদার্থের ভাগ অধিক হয়, তখন সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে

উদ্ভিজ্জ দ্বারা প্রশ্বসিত বায়ু অঙ্গারক বাষ্প বিশ্লিষ্ট হওয়াতে বায়ুরাশির অম্লজনক ভাগ প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। কিন্তু রাত্রিকালে বৃক্ষতৃণাদি হইতে অঙ্গারক বায়ু কিয়ৎপরিমাণে নির্গত হয়। এজন্য শয়নগৃহে পুষ্প, লতা, পত্রাদি রাখা অনিষ্টকর। রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিলে এবং গৃহের নিকটে বৃক্ষ থাকিলেও ঐরূপ দোষ ঘটে।

গৃহে বায়ুসঞ্চালন। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যেরূপে বায়ু দূষিত হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাসগৃহের অভ্যন্তরের বায়ু বাহিরের বায়ুর ন্যায় নির্ম্মল নহে, সুতরাং কোন্ উপায়ে বাহিরের বায়ু গৃহের

ভিতর আনিতে না পারিলে গৃহের বায়ুর দোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাই-বার সম্ভাবনা। নিম্নলিখিত কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মে দূষিত বায়ু বহিষ্করণ ও নূতন বায়ুর সঞ্চার সাধিত হয় প্রক্রিয়াকে সচরাচর বায়ু সঞ্চালন কহে।

(১) বায়বীয় পদার্থের একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, উহা কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই কারণ বশতঃ গৃহের বায়ু স্বতঃই দ্বার ও জানালা দিয়া প্রতি-নিয়ত বাহ্য বায়ুতে মিশ্রিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সচরাচর উহাতে গৃহের বায়ু সম্যকরূপে বিশোধিত হয় না।

(২) উত্তপ্ত হইলে বায়ু আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া শীতল বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়, সুতরাং উর্দ্ধদিকে উঠিয়া থাকে এবং তাহার স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে শীতল বায়ু আসিয়া পড়ে। এই কারণ বশতঃ যখন বাহিরের ও গৃহাভ্যন্তরের বায়ুর তাপপরিমাণ ভেদ লক্ষিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে বায়ুর বিনিময় হইতে থাকে। এইরূপে বাহি-রের বিশুদ্ধ বায়ু গৃহের ভিতর আসিয়া তথাকার দূষিত বায়ুর স্থান পরিগ্রহণ করে। গ্রীষ্মকালে অট্টালিকার দ্বারে খসখসের টাটী সন্নিবেশ করিয়া উহাতে জল দিলে গৃহ শীতল থাকে। ঐরূপ ঘটিবার কারণ এই যে টাটীর উপর রৌদ্রের উত্তাপ লাগিয়া জল বাষ্পে পরিণত হইয়া টাটী ও তৎসন্নিকটস্থ বায়ুর তাপ হরণ করে।

(৪) বায়ুর প্রবাহ চলিতে পাইলেই গৃহাদির বায়ু সুন্দররূপে বিশোধিত হয়। অতএব যাহাতে অব্যাহতরূপে গৃহে বায়ুর গমনাগমন হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। যে যে দিক হইতে সচরাচর বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সেই দিকে ও তাহার দিকে জানালা রাখিয়া দিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। বিদ্যালয়, সেনানিবাস, কারাগার প্রভৃতি জনাকীর্ণ

স্থানে রীতিমত জানালা ও দ্বার ব্যতীত ছাদের দিকে ছিদ্র রাখা আবশ্যক। ছিদ্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বায়ু গমনাগমনের পথ রাখিয়া গামলা স্থাপন করিলে অথবা উচ্চ করিয়া গাঁথিয়া দিলে বৃষ্টির জল গৃহে পড়িতে পায় না। গৃহস্থদিগের বাসগৃহের কড়িকাঠের নিকট দেওয়ালের ভিতর দিয়া ছিদ্র রাখিয়া দিলেও বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়। ঈদৃশ ছিদ্র দিয়া গৃহের উত্তপ্ত লঘু বায়ু বহিষ্কৃত হয় এবং নীচের দিগ হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। গৃহে টানাপাখা টানিলেও বায়ু সঞ্চালিত হইয়া বিশোধিত হয়। বিদ্যালয় প্রভৃতি জনাকীর্ণ স্থানে এরূপ পাখার বন্দোবস্ত করা অতীব প্রয়োজনীয়। উহাতে শরীর-সংলগ্ন উত্তপ্ত বায়ু স্থানভ্রষ্ট হয় এবং তদ্বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু শরীরে লাগে, তাহাতেই পাখা টানিলে সুখ বোধ হয়।

বায়ু সেবন। প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা কাল নির্ম্মল বায়ু সেবন করা আবশ্যক। যাহারা বহু জনাকীর্ণ স্থানে বাস করে তাহাদের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য এজন্য নগরবাসীদিগকে অনেক সময় বায়ু-সেবনের জন্য বাহিরে গমন করিতে হয়। স্বাস্থ্যকর উন্নত প্রদেশের বায়ু আমাদের পক্ষে এত উপকারী যে, অনেক পীড়িত ব্যক্তি ঐ সকল স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সুস্থ ও সবল হইয়াছেন দেখা যায়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরে ও অপরাহ্ণে সূর্য্যাস্তকালে ভ্রমণ ও বায়ু সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, তথায় অতি প্রত্যূষে বেড়াইলে রোগ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি ঐ সময়ে ভালরূপে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া ইতস্ততঃ চালিত হইয়া যায়, সুতরাং পীড়াদায়ক হইতে পারে না। এ দেশের অনেক পল্লীগ্রামে নির্ম্মল বায়ু অতি দুর্লভ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ত্বক্, পরিচ্ছন্নতা ও পরিধেয়।

ত্বকের কার্য্য। সর্ব্বদা শরীর পরিস্কৃত না রাখিলে কোন মতেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। আমাদের লোমকূপ দ্বারা যে সকল দূষিত পদার্থ অনবরত বাহির হইয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ শরীরে থাকিয়া গেলে রোগ জন্মিতে পারে। লোমকূপ দ্বারা যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, বা ঘর্ম্মে পরিণত হয়, এবং অবশিষ্ট ভাগ কঠিন হইয়া শরীরে লাগিয়া থাকে। আমাদের চর্ম্মের সর্ব্বোপরিভাগ নিয়ত উঠিয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন বায়ু, শয্যা প্রভৃতি হইতে সর্ব্বদা আমাদের গাত্রে ধূলা লাগে। এই সমস্ত ময়লা চর্ম্মে লাগিয়া থাকিলে লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা রক্তের দূষিত পদার্থ সম্যক্ নির্গত হইতে পায় না। এই কারণে স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা শরীর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

ত্বকের কার্য্যরোধ হইলে যে সকল পীড়া জন্মিতে পারে তদ্বিষয়ে ডাক্তার এণ্ড্রু কুম্ব সাহেব নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে যে যন্ত্রদ্বারা শরীরগত বিকৃত বা দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, ত্বকের কার্য্য রোধ হইলে সেই সেই যন্ত্রের কোন না কোনটির গ্লানি উপস্থিত হয়। ত্বক্, মলনির্গম ও মূত্রযন্ত্র, ফুস্ফুস্ ও যকৃৎ দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া থাকে;

ত্বকের কার্য্যরোধ হইলে আর কোন একটি যন্ত্র দ্বারা কথঞ্চিৎ সেইরূপ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সেইটী অধিক কার্য্য করিয়া ক্ষীণবল ও রোগোন্মুখ হয়। ঘর্ম্মরোধ হইলে কোন ব্যক্তির অন্ত্র বা মলাশয় উত্তেজিত হইয়া উদরাময় উপস্থিত করে, কাহারও বা ফুস্‌ফুস্ প্রপীড়িত করিয়া কফ, কাসি অথবা অন্ত কোন রোগ জন্মাইয়া দেয়। যে ব্যক্তির শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় যন্ত্র সুস্থ অবস্থায় আছে; ঘর্ম্মরোধে তাহার সামান্ত ক্লেশ মাত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্য লোকের উৎকট পীড়া জন্মিতে পারে।

"অপ্রশস্ত গৃহের অভ্যন্তরে অধিক লোকের সমাগম হইলে তত্রত্য বায়ু উত্তপ্ত হয় বলিয়া সমাগত লোকের শরীর হইতে বাষ্পাকারে অনবরত ঘর্ম্ম বাহির হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদের মূত্রত্যাগের প্রয়োজন হয় না। পরে বাহিরের শীতল বায়ুতে গমন করিলে ঘর্ম্মরোধ হয়, তখন পুনরায় মূত্রত্যাগের প্রয়োজ হইয়া উঠে। মূত্রজননক্রিয়া বন্ধ হইলে ঘর্ম্ম সহকারে না প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তখন ঘর্ম্মে মূত্রের দুর্গন্ধ অনুভূ হইয়া থাকে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে একটী যন্ত্রের কার্য্যরোধ হইলে অপর কোনটীর কার্য্য বৃদ্ধি হয়।

"যে ব্যক্তির ফুস্‌ফুস্ স্বভাবতঃ সবল নয়, অর্থাৎ যাহার কফ, কাসি সহজেই হইয়া থাকে, এরূপ লোকের ঘর্ম্মরোধ হইলে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুস্ হইতে অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইতে থাকে, তাহা দূরীকৃত হইতে না পারিলে ফুস্‌ফুসের সমস্ত বায়ুকোষ কফপূর্ণ হইয়া নিঃশ্বাস রোধ করিতে পারিত, কিন্তু এই অনিষ্ট নিবারণের একটী সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ুকোষে কফের সঞ্চয় হইবামাত্র এরূপ অসুখ বোধ হয় যে,

যাঁহারা তৎক্ষণাৎ কাশিতে আরম্ভ করি তাহাতে কফ বহির্গত হইয়া যায়। ঘর্ম্মরোধ হইয়া কখন কখন ফুস্‌ফুসের ঝিল্লিবিকৃত রোগ উপস্থিত হয়, এ রোগে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"ঘর্ম্মরোধ হইলে কফ জন্মিবার বিশেষ কারণ আছে। শীত-প্রভাবে সকল বস্তুই সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং আমাদের ত্বকে সহসা শীতল বায়ু অথবা জল লাগিলে তত্রত্য সমস্ত রোমকূপও সঙ্কুচিত হয়, অথবা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। লোমকূপদ্বারা দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রে যাইয়া পীড়া উপস্থিত করে। সর্দ্দি লাগিলে শরীর ও মন যেরূপ অস্বচ্ছন্দ হয়, সকলেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কাহারও দন্তশূল জন্মাইয়া দিয়া নিদ্রা হরণ করে, কাহারও বা ক্লেশকর জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। কফ বসিতে দিলে অনেকের জ্বর হইয়া থাকে। পাকযন্ত্রের যে সকল রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয়, কফই তাহার অনেকগুলির আদিকারণ; অতএব কফ কাসি না হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। কফ নিবারণের যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে স্নান ও ত্বক্‌মার্জ্জনা প্রধান। কফ লাগিলে কোনরূপে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শরীরে সামর্থ্য থাকিলে কিয়ৎকাল শারীরিক পরিশ্রম করিলেই ঘর্ম্মারম্ভ হয়; তৎকালে যেন আর ঘর্ম্মরোধ না হয় এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই কফ অন্তর্হিত হইয়া যায়। উক্ত রূপ পরিশ্রম করিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল পান করিলেই ঘর্ম্ম-নিঃসরণের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কখন কখন কফ দূরীভূত হয়। অনেকে সর্দ্দি

অধিক পরিমাণে জলপান করিয়া এক দিন অনাহারী থাকিলে সহজে কফের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

স্নান। ত্বক্ পরিষ্কৃত রাখিবার জন্ত প্রত্যহ স্নান করা আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, কারণ তৎপ্রদেশে সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম হওয়াতে শরীরনিঃসৃত তৈলবৎ পদার্থে মলা সংযুক্ত হয়, তখন রোমকূপ সকল রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ গুলি পরিষ্কৃত না হইলে কোন না কোন রোগ জন্মে। সচরাচর শীতল জলে স্নান করা ভাল। শীতল জলে স্নান শরীরের পক্ষে বলকারক; তাহাতে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয় ও কফ, কাসি হইবার বড় সম্ভাবনা থাকে না। শীতল জলে স্নান করিয়া উঠিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যসুখ অনুভূত হয় এবং ক্ষণকাল মধ্যে ত্বকের দিকে রক্তের গতি হওয়াতে শীত কমিয়া যায়।

শীতল জলে স্নান করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি এবং পরিপাক শক্তির উন্নতি হয়। কিন্তু অধিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়; কারণ স্নায়ু সকল কিয়ৎকাল উত্তেজিত থাকিয়া পরে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যে সময়ে শরীরের বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়, এবং স্বল্প উত্তাপ লক্ষিত হইতে থাকে, তাহার অবিলম্বেই জল হইতে উঠা আবশ্যক।

কোন কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তিরা শীতল জলে স্নান করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ে। যাহাদের শরীর ঈদৃশ অবস্থাপন্ন, যত দিন তাহাদের শরীর সবল না হয়, তত দিন ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা তাহাদের পক্ষে বিধেয়। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া অল্পক্ষণ পরে স্নান করা উত্তম। কিন্তু সকলে এ ব্যবস্থা পালন করিয়া উঠিতে পারে না। পূর্ব্বাহ্নে ভোজনের কিয়ৎকাল

পূর্ব্বে স্নান করা অনেকের অভ্যাস। পরিষ্কৃত শরীরে আহার যুক্তিসিদ্ধ বটে।

অবগাহন স্নানে অতি সহজে শরীরের মলা দূর হয় এবং সর্ব্বশরীরে সুখানুভব হইতে থাকে। যে নদী বা পুষ্করিণীর জল উৎকৃষ্ট তাহাতেই স্নান করা কর্ত্তব্য, নতুবা পীড়া হইবার সম্ভাবনা। জল মন্দ হইলে ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া, পরে শীতল হইলে, তাহাতে স্নান করা উচিত।

আমাদের দেশের অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, অন্ত এক জলাশয়ের, কল্য অন্ত জলাশয়ের জলে স্নান করিলে, সর্দ্দি, জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। কোন কোন পুষ্করিণীর জল লোণা, ভারী, শীতল, অপরিষ্কৃত বা পচা; সে জলে স্নান করিলে অসুখ হইবারই কথা; কিন্তু কোন ভাল পুষ্করিণী বা নদীর পরিবর্ত্তে তাদৃশ অন্ত জলাশয়ে স্নান করিলে কখনই পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে বিদেশে গেলে নানা প্রকার অনিয়ম করিয়া অসুস্থ হইয়া থাকে; শেষে জলের দোষ দিয়া নিজের দোষ ক্ষালন করে।

প্রত্যহ এক সময়ে স্নান করিলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে এবং বৈষয়িক কার্য্য সকল সময়মত করা যাইতে পারে। পীড়াকালে স্নান করিতে হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত। গৃহের অভ্যন্তরে যেখানে বায়ুর সঞ্চার হয় না, এরূপ স্থানে বসিয়া স্নান করিবে। সহসা শীতল বাতাস গায়ে লাগিতে দিবে না, কারণ তাহাতে লোমকূপ সঙ্কুচিত হওয়াতে সর্দ্দি লাগিতে ও জ্বর হইতে পারে। শ্রম করিয়া যৎকালে শরীর উত্তপ্ত হয়, তখন শীতল জলে স্নান করিলে ঘর্ম্মরোধ হইয়া পীড়া জন্মিতে পারে। অতএব পরি-শ্রমের পর সুন্দররূপ বিশ্রাম না করিয়া স্নান করিবে না।

এদেশে সহজ শরীরে নিয়মিত উষ্ণ জলে স্নান অভ্যাস করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। উহাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া থাকে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং কোন কারণ বশতঃ অল্প শীত বা শিশির ভোগ করিলেই পীড়া জন্মে। ত্বকই শরীরের স্বাভাবিক আবরণ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উষ্ণ জলে স্নান করিলে উহাতে আর প্রকৃতরূপে শরীরের আবরণের কার্য্য হয় না, তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কৃত্রিম আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে হয়।

অবগাহন করিয়া স্নান করিবার কালে শরীর ইতস্ততঃ চালনা করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। তাহাতে ব্যায়ামজনিত সুখানুভব হইতে থাকে, এবং কিঞ্চিৎ অধিককাল জলে থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। গায়ে অধিক মলা থাকিলে সাবান বা ব্যাসোম দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে হয়। অভ্যাস অনুসারে কেহ বা অল্পক্ষণ কেহ বা অধিকক্ষণ জলে থাকিয়া স্নান করে, কিন্তু শীতকালে ১০। ১৫ মিনিটের অধিককাল জলে থাকিলে অনেকের পীড়া হয়। যৎকালে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন স্নান বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

স্নানের জন্য জলে নামিবার পূর্ব্বে মাথায় একটু জল দিয়া তাহার পরে অবগাহন করিবে। লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। তাহাতে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিতে পারে। আবার জলের ভিতরে কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি কোন কঠিন পদার্থ অদৃশ্যভাবে থাকিলে এককালে প্রাণবিনাশ হইবার কথা।

স্নানান্তে শুষ্ক মোটা কাপড় বা তোয়ালে দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। অন্যান্য সময়েও গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার এইরূপ করা উচিত। রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া

গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীর পরিষ্কৃত হয় এবং স্নানক্রিয়ার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে।

স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিলে পীড়া হয়। বস্ত্রের জল বায়ুর সংযোগে বাষ্প হইতে থাকে। কিন্তু কোন তরল পদার্থ বাষ্প হইবার সময় নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে, সুতরাং শরীর-লগ্ন বস্ত্রের জলও বাষ্প হইবার সময়ে শরীরের তাপ নষ্ট করে। যে অঙ্গের তাপ হৃত হয়, তত্রত্য রক্ত স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অন্য অঙ্গে গমন করিয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। গৃহ হইতে দূরে স্নান করিতে গেলে পরিধান বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

এতদ্দেশে অনেকে শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকেন। ইহাতে শরীরের বেশ উপকার হয়। তৈল মাখিলে সহজে ঠাণ্ডা লাগে না এবং শরীর মসৃণ ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকে। মস্তকে তিল তৈল দিয়া স্নান করিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে।

হস্তপদাদি অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে প্রক্ষালন করিয়া গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ঐরূপ করিলে উপকার হয়।

মলিনতা। আমাদের দেশের অনেকেই মলিন বসন পরিধান এবং অপরিষ্কৃত শয্যা ও আসনে শয়নোপবেশনাদি করিয়া থাকেন। এরূপ করাতে শরীরে নানা প্রকার মলা সংযুক্ত হয়, সুতরাং তাহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা এক বস্ত্র পরিধান করিলে তাহা পরিষ্কৃত থাকে না। এজন্য গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ দুইবার ও শীতকালে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত; রোগ বিশেষে অষ্ট বার ঐরূপ করা আবশ্যক। প্রত্যহ পরিধানবস্ত্র সুন্দররূপে ধৌত করিবে,

এবং সপ্তাহে অন্ততঃ একবার রজকগৃহে পাঠাইবে। অনেকে ঘর্ম্মসিক্ত দুর্গন্ধময় কাপড় প্রতিনিয়ত ২০।২৫ দিন ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ করা অবৈধ।

আমাদের শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা তাহা অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

যাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত থাকে, তাহাদের দাদ, পাচড়া প্রভৃতি নানা প্রকার কুৎসিত ও কষ্টদায়ক রোগ হইয়া থাকে। তাহাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণাবোধ হয়। অপরিষ্কৃত লোকের বস্ত্র পরিধান, গামছা ব্যবহার ও শয্যায় শয়ন করা অনুচিত, তাহাতে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে।

পরিধেয়। শরীরে অধিক শীতল বা অধিক উষ্ণ বায়ু লাগিলে ক্লেশ হইয়া থাকে; তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক। যখন অতিশয় শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় তৎকালে শরীর সুন্দররূপে আবৃত না রাখিলে শারীরিক তাপ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়; তাহাতে প্রথমতঃ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া স্থগিত হয় ও পরিশেষে মৃত্যু হইতে পারে। বঙ্গদেশের নিম্ন-প্রদেশে শীত অতি অল্প; কিন্তু ইংলণ্ড, রুষিয়া প্রভৃতি দেশে শীতের এত প্রাদুর্ভাব যে, তত্রত্য বহুসংখ্যক লোক প্রয়োজনমত শীতবস্ত্রের অভাবে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এদেশে শীতকালে অনাবৃত শরীরে থাকিলে সহসা মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ফুস্ফুসের রোগ-পরম্পরা উপস্থিত হইয়া পরিণামে মৃত্যু হইতে পারে।

বস্ত্রের প্রয়োজন। উপযুক্ত গাত্রাবরণ ব্যবহার না

করিলে শীতল বায়ু সংযোগে ত্বকের তাপ পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহাতে ত্বগভিমুখে উচিত পরিমাণ রক্ত সঞ্চালিত হইতে না পারিয়া শরীরের অভ্যন্তরে যন্ত্রবিশেষে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রদাহ উৎপাদন করে। উহাতে সচরাচর ফুস্ফুসই প্রপীড়িত হয়। কিন্তু যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র, মস্তিষ্ক, হৃদয় প্রভৃতিও সময়ে সময়ে রোগাক্রান্ত হয়। বৃদ্ধ বা পীড়িত ব্যক্তি ও শিশুগণ শীতের প্রভাবে শীঘ্র কাতর হইয়া পড়ে। যাহারা সবল এবং নিয়ত শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহারা বিলক্ষণ শীত সহ্য করিতে পারে। কিন্তু যাহারা অলস তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প শীতে অসুস্থ হয়।

দেশের তাপপরিমাণ ও ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদ্‌বিশেষের ত্বক্ অথবা তুলা এবং প্রাণিবিশেষের গুটি, লোম ও চর্ম্ম হইতে পরিধেয় প্রস্তুত হয়। এদেশে কার্পাসসূত্রের বস্ত্রই বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাট পশম, তসর গরদ প্রভৃতিও অপ্রচলিত নহে।

আমরা যে সকল বস্ত্র পরিধান করি, তন্মধ্যে কোনটার দ্বারা অল্প পরিমাণে, কোনটার দ্বারা অধিক পরিমাণে তাপ পরিচালিত হয়। যেটার বেশী অপরিচালকতা গুণ আছে, সেইটা শীতকালে বা শীতপ্রধান দেশে সমধিক আদরণীয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে ও গ্রীষ্মকালে পরিধেয় অপেক্ষাকৃত পরিচালক হইলে ক্ষতি হয় না। যে কয়েকটী পদার্থে সচরাচর বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, নিম্নে তাহাদের গুণাগুণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

কার্পাস সূত্রের বস্ত্র। কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র সুলভ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। উহা রজকগৃহে পাঠাইলে সহজে পরিষ্কৃত হয়, উহাতে জল শোষিত হয় না, এবং উহার অপরিচালকতা

গুণ পশম অপেক্ষা কম, কিন্তু ছালটী অপেক্ষা বেশী। কার্পাস সূত্রের উৎকৃষ্ট বস্ত্র মসৃণ এবং উহার সূতা সকল স্থানে সমান ও সমদূরবর্ত্তী। উহা পরিধান করিয়া বেড়াইলে ঘর্ম্মসিক্ত হয়। তাহাতে আর্দ্রবস্ত্র পরিধানের দোষ ঘটে; অর্থাৎ শরীর শীতল হইয়া সর্দ্দি লাগে। সম্প্রতি "সেলুলার কটন্" নামক কার্পাস-সূত্রের কাপড় কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাতে ঐ দোষ প্রায় নাই।

ছাল্‌টী কাপড়। ছাল্‌টীর কাপড় কার্পাসের কাপড় অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অধিক পরিচালক, জলশোষক ও মসৃণ। ইহার সূত্রগুলির সূক্ষ্মতা, সমতা, শুভ্রতা ও সুচিক্কণতা অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি হয়; পাটের সূত্রে এক্ষণে ইংলণ্ডে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ছাল্‌টীর ন্যায় সুন্দর নহে, কিন্তু তাহা সুলভ ও তাহার ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

পশমী কাপড়। পশমী কাপড় অতি অপরিচালক ও জলশোষক। উহা শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত হয়। উহা গাত্রে ধারণ করিলে শীতল বায়ু শরীরে লাগে না, এবং যখন ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া শরীর ক্লান্ত হয়, তৎকালে উহা ব্যবহার করিলে সর্দ্দি লাগিতে পারে না। কিন্তু পশমী কাপড় যত ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়, ততই উহার আয়তন হ্রস্ব হয়, সুতরাং ক্রমে উহা গায়ে ছোট হয় এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। তখন উহাতে আর উৎকৃষ্টরূপে জল শোষিত হয় না। যে পশমী কাপড় অতি মসৃণ, কোমল ও ভারী এবং যাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র দৃষ্ট হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে মেষলোম হইতে পশমী কাপড় প্রস্তুত হইত, কিন্তু এক্ষণে অন্যান্য পশুর লোমও ব্যবহৃত হইতেছে। আলপাকা বস্ত্র এক জাতীয় ছাগলের লোমে প্রস্তুত

হয়। স্পেন দেশীয় মেষবিশেষের লোমে মেরিণো কাপড় জন্মে। উহা ফ্লানেল, বনাত ও কাশ্মীরী অপেক্ষা লঘু। হিমালয় পর্ব্বতের ছাগবিশেষের লোমে শাল হয়। পাতলা ফ্লানেলের কাপড় শরীর সংলগ্ন করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক সময় রোগ হইতে পারে না।

পশুচর্ম্ম বস্ত্র। পশুচর্ম্মই মনুষ্যের আদিম পরিধেয়। এক্ষণেও পারস্য, তাতার, তুরস্ক, রুষিয়া প্রভৃতি দেশে উহা শীত-বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। উহা সহসা বৃষ্টির জলে ভিজে না এবং অতিশয় অপরিচালক। উহা দ্বারা অতি প্রচণ্ড শীত নিবারিত হয়।

রবারের কাপড়। যাহাদের সর্ব্বদা বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়, তাহাদের ব্যবহারের জন্য রবর নির্ম্মিত পোষাক প্রস্তুত হয়। উহার উপর জল পড়িলে ভিতরে প্রবেশ করে না, উপর হইতে গড়াইয়া যায়। কিন্তু উহার ভিতরে একেবারে বায়ু প্রবেশ করে না বলিয়া উহা ব্যবহার করিবার সময় অসহ্য গ্রীষ্মানুভব হয়।

রেশমের কাপড়। এদেশে ত্রিবিধ রেশমের কাপড় প্রচলিত, এণ্ডী, তসর ও গরদ। এইগুলি কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা সুশ্রী, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অপরিচালক। তসর ও কার্পাসসূত্রে মিশাইয়া থেস্, বাফতা প্রভৃতি বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এইগুলি রেশম অপেক্ষা সুলভ ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। গরদের কাপড় পরিধান করিলে বিশেষ আরাম বোধ হয়, কিন্তু উহা শরীর সংলগ্ন থাকিলে শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়।

সাধারণ। গ্রীষ্মকালে শুভ্রবর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করা ভাল। উহাতে সূর্য্যের তাপ লাগিলে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন শুভ্রবস্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণবস্ত্র

কোন কোন রোগের বীজ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিবে। এদেশে গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে কাপড় লাগে না, কিন্তু শীতকালে নানাবিধ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। শীতকাল উপস্থিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শীতবস্ত্র ব্যবহার করিবে, এবং শীতের অবসানে সহসা শীতবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না। শীতকালের শেষে কোন দিন অল্প, কোন দিন বা অধিক শীত হয়; যৎকালে অল্প কাপড় গায়ে থাকে, তখন সহসা শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে শরীর অসুস্থ হয়। তাহাতে জ্বর, কফ, কাসি প্রভৃতি রোগ জন্মে। শীতকালের প্রারম্ভে ও শেষে পরিধেয় বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে প্রাত্যহিক তাপ পরিমাণের উচ্চ ও নিম্ন সীমার অন্তর এত অধিক যে, প্রত্যূষে অনায়াসে গরম কাপড় ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বেলা হইলে উহা আর গাত্রে রাখা যায় না। কলিকাতা ও ঢাকায় ঐ তাপভেদের পরিমাণ ২১ হইতে ৩০ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

শীতকালে নিদ্রিতাবস্থায় আমরা সচরাচর লেপ, কম্বল প্রভৃতি ব্যবহার করি, কিন্তু বর্ষাকালে এবং শীতের প্রারম্ভে ও অন্তে উপযুক্ত গাত্রাবরণ ধারণ না করিয়া অনেকে রোগগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাসগৃহ।

বাসগৃহ নির্ম্মাণকালে নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(১) উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ।

(২) বায়ু ও রৌদ্র সমাগমের উপায়।

(৩) জলীয় বা তরল বস্তুর দূরীকরণ জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ।

(৪) গৃহের ভূমি শুষ্ক রাখিবার বন্দোবস্ত।

ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটীর বিবরণ করা যাইতেছে।

(১) শুষ্ক ও উন্নত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। বঙ্গদেশের পললময় প্রদেশে নদীতীরস্থ ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ; সুতরাং এরূপ স্থানে বহুসংখ্যক লোকের বাস। পাহাড়িয়া প্রদেশের খাল ও নদীতীর সর্ব্বদা আর্দ্র ও উদ্ভিদময় থাকে, এজন্য ঐ সকল স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। বালুকাময় ভূমি তৃণাবৃত হইলে বাসের উপযুক্ত হয় বটে, কিন্তু তৃণাবৃত না হইলে অতিশয় উত্তপ্ত হয়।

উন্নত পার্ব্বতীয় প্রদেশ নিম্নভূমি অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। ঈদৃশ স্থানে জলাভূমি ও ম্যালেরিয়া প্রায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পললময় ভূভাগে বহুসংখ্যক জলা ও বিল থাকে; এবং তৎপ্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব অনুভূত হয়। রাস্তার আবর্জ্জনারাশি দিয়া যে পুষ্করিণী বা গর্ত্ত পূরণ করা হয়, তাহার উপর কখনই গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না; কারণ ঈদৃশ স্থান হইতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত পীড়াজনক বাষ্প উত্থিত হয়।

(২) গৃহে বায়ু ও রৌদ্র সমাগমের উপায় রাখিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে খালী জমি রাখিয়া দিবে, এবং বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী রাজপথ প্রশস্ত রাখিবে। পূর্ব্বকালে দস্যুভয়ে বহু সংখ্যক লোকে সঙ্কীর্ণ স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত এবং পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিবার রাস্তা অতি অপ্রশস্ত রাখিত। কিন্তু এক্ষণে আর ওরূপ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে গলি ও রাস্তা প্রশস্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের অভ্যন্তরে সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালনের জন্য রীতিমত দ্বার ও জানালা রাখা আবশ্যক। দেয়ালের ঘর বা বেড়ার ঘরে প্রায় চালের নিকট দিয়া বায়ু সমাগমের পথ থাকে, ঐ পথ দিয়া গৃহের দূষিত বায়ু বহির্গত হয়। ঈদৃশ গৃহে অপেক্ষাকৃত কম জানালা ও দ্বার রাখিলে ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু ঐগুলি এরূপ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক যে তদ্দারা অব্যাহতরূপে গৃহের ভিতর রৌদ্র ও বায়ু আসিতে পারে।

যে প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, তথায় বাটীর কিঞ্চিত দূরে ঘন করিয়া চারিদিকে এরূপে বৃক্ষ রোপণ করিবে যে, তাহার শাখা পত্রাদি ভেদ করিয়া দূষিত বায়ু আসিতে না পারে। বাসগৃহের নিকটেই তরুশ্রেণী রোপণ বা প্রাচীর নির্ম্মাণ করা অবিধেয়; কারণ উহাতে রৌদ্র ও বায়ু সমাগমের ব্যাঘাত হয়। গৃহের নিকটে তৃণাবৃত ভূমি থাকিলে রৌদ্রের তাপ অল্প পরিমাণে অনুভূত হয়। সুদৃশ্য বৃক্ষের ছায়াও মনোরম।

কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটে দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঈদৃশ গৃহে উত্তর ও পূর্ব্বদিগের ক্লেশদায়ক বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমের মনোহর বায়ু অব্যাহতরূপে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বারী ঘর বিহার প্রদেশে অনেক দৃষ্ট

হয়, কারণ তথায় কয়েক মাস পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। উত্তরদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। উহাতে বাস করিলে শীতকালে শীতে কাঁপিতে হয়, এবং গ্রীষ্মকালে বাতাস অভাবে গ্রীষ্মে কষ্ট পাইতে হয়। কথিত আছে, হিন্দু রাজারা উত্তরদ্বারী ঘর অপকৃষ্ট বলিয়া তাহার কর গ্রহণ করিতেন না।

বাসগৃহ দক্ষিণ বা পশ্চিমদ্বারী হইলে ভাল বটে, কিন্তু উহাতে সকল দিক হইতে বায়ু সমাগমের জন্য জানালা বা দ্বার রাখা আবশ্যক। বাসগৃহে অব্যাহতরূপে রৌদ্র ও বায়ু আসিতে না পারিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। উত্তর বা পূর্ব্বদ্বারী ঘরেও পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে জানালা রাখিলে তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই শয়নমন্দিরের বায়ু নির্ম্মল রাখা উচিত। দিনমানে সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। রাত্রিকালে শয্যার পার্শ্বের জানালা বন্ধ করিয়া দূরের জানালা এরূপ খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, তদ্দ্বারা ঘরের দূষিত বায়ু বাহির হইতে পারে। কোন দিক হইতে অপরিষ্কার বায়ু আসার সম্ভাবনা থাকিলে সে দিকের জানালা বন্ধ রাখিবে। গৃহের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে কুজু জানালা রাখা প্রয়োজন। কোন রকমে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জানালা বন্ধ থাকিলে নানা প্রকার দোষ ঘটে। সচরাচর অনেক ইষ্টকনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকার দেয়ালবিশিষ্ট এরূপ বাসগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে প্রবেশ করিবার একমাত্র দ্বার আছে। জানালা একটীও নাই এবং রৌদ্র ও বায়ু সমাগমের কোন উপায় নাই। এইরূপ গৃহে অবরুদ্ধ হইলে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। কোন কোন গৃহে জানালা আছে দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ গুলি খোলা হয় না। জানালার উপর প্রদীপ, বাক্স, হাঁড়ি অথবা

জলের কলসী রাখিয়া জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ঈদৃশ ব্যবহার আলস্য বা অজ্ঞতা বশতঃ হইয়া থাকে। কেহ কেহ গৃহের দেয়ালে থুথু ও পানের পিক ফেলিয়া গৃহ অপরিষ্কৃত করেন। রোগ বিশেষের থুথু শুষ্ক হইয়া ক্রমে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং পরে অন্যের পীড়া উৎপাদন করে। গৃহে তামাকের গুল, কয়লা প্রভৃতি ঢালাও ভাল নহে। বিদ্যালয় প্রভৃতি গৃহে কয়েক ঘণ্টা বহুলোকের সমাগম হয়, এজন্য তাহার বায়ু অনুক্ষণ দূষিত হইতে থাকে। বড় বড় দ্বার, জানালা রাখিলেও ঐ বায়ুর দোষ থাকিয়া যায়। এই কারণে ঈদৃশ গৃহে বড় টানাপাখা খাটাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। ফলতঃ যৎকালে গৃহে বাহিরের বায়ু প্রবলবেগে গমনাগমন না করে, তখন পাখাটানা বায়ু বিশোধনের একটী প্রধান উপায়।

(৩) জল নিকাশের ও নর্দ্দামার ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে বাসস্থান স্বাস্থ্যকর হয় না। বাটীর ভূমি এরূপ ঢালু রাখা আবশ্যক যে, সকল স্থানের জল নর্দ্দামা দিয়া বহির্গত হইতে পারে। বাটীর নর্দ্দামা পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা বিধেয়, কিন্তু উহা এক ফুটের অধিক গভীর হইলে প্রায় পরিষ্কৃত থাকে না। কাঁচা নর্দ্দামায় জল শোষিত হয়, তাহাতে ভূমি আর্দ্র ও অপরিষ্কৃত হইয়া যায়। নর্দ্দামায় মনুষ্য পশ্বাদির মলমূত্র বা আবর্জ্জনা কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। কোন কোন গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী এরূপ অপকৃষ্ট যে, বারাণ্ডার জল গড়াইয়া বাহিরের দিকে না গিয়া ঘরের দিকে আসে। এমারতের পার্শ্বস্থ ভূমি বাটীর উঠান অপেক্ষা নিম্ন হইলে বৃষ্টির জল এমারতের তলায় প্রবেশ করিয়া গৃহের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে। গৃহ নির্ম্মাণ কালে এ সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

খোয়া, প্রস্তর বা কাঁকর পিটিয়া বাটীর উঠান প্রস্তত করিতে পারিলে অতি উত্তম হয়। এই সকল দ্রব্যের অভাবে ভাল শক্ত আটাল মাটী দিয়া দুর্ম্মুষ করিবে; তাহা হইলে ভূমির অভ্যন্তরে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। উঠান ঢালু করিয়া প্রস্তত করিলে বৃষ্টির জল গড়াইয়া সন্নিহিত রাজপথের নর্দ্দামায় পড়িবে।

পাকা পায়খানা প্রস্তত করিবে এবং প্রত্যহ উহার ময়লা দূরীকরণের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে। কুয়া পায়খানা অনিষ্টকর। কেহ কেহ বাটীর নিকটে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আবর্জ্জনা ফেলে, কেহ বা রাস্তা ও নর্দ্দামার ধারে মলত্যাগ করে। এরূপ করিলে তত্রত্য ভূমি ও বায়ু দূষিত হয় এবং সন্নিহিত কূপাদির জল বিষাক্ত হইতে পারে। যদি প্রত্যহ পায়খানা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত অসাধ্য হয়, তাহা হইলে কোনমতে বাটীতে পায়খানা রাখিবে না। জনাকীর্ণ গ্রামে দুই চারিটী সরকারী পায়খানা রাখিলে চলিতে পারে। যাহাদের বাটীর নিকট বৃহৎ বাগান বা খালী জমী আছে, তাহারা বাটী হইতে দূরে এক একটী অগভীর গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে মলত্যাগ করিতে পারে। মলত্যাগের পর তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া ফেলা আবশ্যক, তাহা হইলে উহার দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হইবে না। অনেকের বাটীতে পায়খানা নাই, উহারা মাঠে যাইয়া মলত্যাগ করে। পূর্ব্বোক্ত রূপে গর্ত্ত বা খপগার কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে মলত্যাগের বন্দোবস্ত তাহাদের পক্ষেও অসম্ভব নহে। মেথর দিয়া যে সকল পায়খানা পরিষ্কৃত হয়, তাহার মলরাশিও ক্ষেত্র বিশেষে পুতিয়া ফেলা আবশ্যক। অনেকে নদী বা পুষ্করিণীর তীরে কিংবা রাস্তার ধারে মলত্যাগ করে, এরূপ ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত।

কুয়া পায়খানা প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হয় না বলিয়া উহা

এদেশের অনেক স্থানে প্রচলিত। কূয়া পায়খানা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। উহার গলিত মল দ্বারা বায়ু দূষিত হয়, এবং উহার নিকটে যে কূপ বা পুষ্করিণী থাকে, মৃত্তিকার ভিতর দিয়া তাহার জলের সহিত উহার যোগ হয়, সুতরাং তাহাতে পানীয় জলে গলিত মলরাশি সংযুক্ত হয়।

(৪) গৃহের ভূমি শুষ্ক রাখিবার জন্য কয়েকটী প্রধান নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। ঘরের মেজে, সন্নিহিত ভূমি ও রাস্তা অপেক্ষা উচ্চ রাখা আবশ্যক, নতুবা উচ্চ ভূমিতে যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা শোষিত হইয়া মাটীর ভিতর দিয়া আসিয়া ঘর আর্দ্র করিয়া ফেলে। ঘরে মেজের নীচে এক ফুট করিয়া বালুকা সন্নিবেশ করিবে অথবা কতিপয় বালুকাপূর্ণ কলসী পাশাপাশী করিয়া স্থাপন করিয়া তাহাদের ব্যবধানসমূহ বালুকাদ্বারা পূরণ করিবে। বালুকার উপর শক্ত আটালমাটী পিটিয়া দিবে। এরূপ করিলে মেজে শুষ্ক থাকে। পাকাঘরের মেজে সুর্কি ও কাঁকর দিয়া পিটিয়া পরে বিলাতী মাটীর পলস্ত্রা করিবে। তাহা হইলে আর্দ্র হইবে না। সঙ্গতি হইলে নীচের ঘরের মেজে খিলান করিবে এবং নিম্নদিক দিয়া বায়ু গমনাগমনের উপায় রাখিবে।

বাসগৃহের নিকটে গোশালা বা পশুশালা নির্ম্মাণ করিবে না। পশুশালার মেজে আটাল মাটী অথবা কাঁকর দিয়া পিটিয়া এরূপ ঢালু রাখিবে যে মূত্রাদি গড়াইয়া নর্দ্দামায় পড়িতে পারে। নর্দ্দামার নিকট জালা বা গামলা এরূপে স্থাপন করিবে যে উহাতে মূত্রাদি সংগৃহীত হইতে পারে। পরে ঐ সকল পদার্থ প্রত্যহ ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তথায় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। উহার উপর মৃত্তিকা চাপাইলে আর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, কারণ শুষ্ক মৃত্তিকা

দুর্গন্ধনাশক। এরূপ করিলে অন্য একটী উপকার হয়, উপরোক্ত ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

গোময় প্রভৃতি হইতে ঘুঁটা প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা জ্বালানী কাষ্ঠের অনেক সাহায্য হয়। কিন্তু সাবধান যেন পূর্ব্বেই উহা পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার না করে। কিন্তু ঘুঁটে প্রস্তুত না করিয়া ঐ গোময় বাটী হইতে দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে লইয়া গেলে আরও ভাল হয়। প্রত্যহ ক্ষেত্রবিশেষে গোময় প্রভৃতি লইয়া সার দিতে পারিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বাড়িয়া যায়। যেখানে বাসস্থানের নিকটে ক্ষেত্র নাই, সেখানে নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত করা উচিত।

যে দিক হইতে সচরাচর বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে বাটী হইতে কিয়দ্দূরে একটী স্থান মনোনীত করিয়া তথায় এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিবে। ঐ গর্ত্তে বাটীর মলমূত্র আবর্জ্জনা এবং গোশালা ও রন্ধনশালার পরিত্যক্ত কঠিন পদার্থ প্রত্যহ নিক্ষেপ করিবে এবং উহা আধ হাত পুরু শুষ্ক মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদন করিবে। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে ঐ পদার্থ-গুলি সার রূপে পরিণত হইবে, তখন উহা ক্ষেত্রে লইয়া ভূমিতে দিলে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইবে। একটী গর্ত্তে না হয়, ৩।৪টী গর্ত্ত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক একটী ব্যবহার করিলে সুবিধা হইতে পারে; একটি পূর্ণ হইলে অন্যতরটী পূর্ব্ব নিয়মে ব্যবহার করিতে হয়।

এদেশে অনেক গৃহস্থের বাটীতে মূত্রত্যাগ ও রন্ধনশালার তরল পদার্থ নিক্ষেপ করিবার যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এত অপরিষ্কৃত ও পূতিগন্ধময় যে, তদ্দ্বারা তত্রত্য বায়ু অনুক্ষণ দূষিত হয়, সন্দেহ নাই। রন্ধনশালার জলীয় দ্রব্যাদি এবং বাসন মাজিবার সময়ের পরিত্যক্ত পদার্থগুলি স্বতন্ত্র গামলায়

রাখিয়া পরে উপরি উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করা আবশ্যক। ইউরোপীয়েরা চিনের গামলায় মূত্রত্যাগ করেন এবং ঐ মূত্র দূরে নীত হয়। যদি গৃহস্থের বাটীতে মাটীর গামলা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে মূত্রাদি দূরে প্রেরণ করা সহজ হইয়া উঠে।

বাটীর উঠানে যে পচা পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকা থাকে, তাহা উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক। পরে তাহার পরিবর্ত্তে শুষ্ক মাটী আনিয়া পিটিয়া দিলে অনেক উপকার হয়।

এ দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা চক মিলাইয়া ইষ্টকালয় প্রস্তুত করেন, তাহাতে গৃহে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। যাহাদের অবস্থা তত উত্তম নহে, তাঁহারাও বড় মানুষদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া বাটীর চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলেন। অনেক চক-মিলান বাটীতে রন্ধনকালে ধূম নির্গত হইবার ভাল উপায় থাকে না, তাহাতে প্রত্যহ দুই বেলা বাটীর সকলেরই কষ্ট হয়। এক্ষণে কোন কোন গৃহে ছাদের উপর রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়েছে। উহাতে বিশেষ সুবিধা আছে।

এদেশে এমন কুৎসিত প্রণালীতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হয় যে, তাহাতে বায়ু গমনাগমনের পথ থাকে না। তথাকার মৃত্তিকাও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। এরূপ গৃহ সকল সময়েই অস্বাস্থ্যকর; বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। সুস্থ-কায় সবল ব্যক্তিরাও এরূপ গৃহে বাস করিলে অল্পকালের মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়েন। কিন্তু এদেশের প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানেরা এরূপ দুর্ভাগ্য যে, তাহাদিগকে তথায় প্রায় এক মাস বাস করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় যে তাহাদিগকে নানাক্লেশকর রোগে ভুগিতে ও অকাল মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হইবে, তাহা

আর বিচিত্র কি ? আমরা প্রাচীন কুপ্রথার অনুগামী হইয়া এই বিষয়ে কত গুরুতর অপরাধ করিতেছি, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেশস্থ ভদ্রলোকেরা মনোযোগ না করিলে ইহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে কলিকাতার কোন কোন ভদ্রলোক বাটীর মধ্যে উৎকৃষ্ট গৃহ সূতিকাগৃহে পরিণত করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। সাধারণে ইহাদের অনুকরণ করিলে দেশের মঙ্গল হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

গ্রাম-সংস্করণ।

বর্ষাকালের জল নিকাশের উপায় অনেক গ্রাম ও নগরে দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নালা, নদী ও খাল দিয়া জল প্রবাহিত হইত। অনেক স্থলে ভূম্যধিকারীদিগের অনবধানতা বশতঃ সেইগুলি ভরাট হইয়াছে, অথবা বাঁধ দেওয়াতে পুষ্করিণীরূপে পরিণত হইতেছে, ঐ সকল পুষ্করিণীর পাড় অতিক্রম করিয়া আর জল চলিতে পারে না। কোন কোন স্থলে কৃষিকার্য্যের বিস্তারবশতঃ খাল বিলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত কর্ষিত হইতেছে সুতরাং তদ্দ্বারা আর পূর্ব্বের ন্যায় জল চলে না। কতিপয় গ্রামের নিকট দিয়া উচ্চ রাজবর্ত্ম ও রেলরোড নির্ম্মিত হওয়াতে প্রাচীন নালা খাল প্রভৃতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা লোকে মৃত্তিকাদি দিয়া খাল পূরণ করিয়া তদুপরি রাস্তা বা

গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোথাও বা বৃষ্টির ধোয়ানি মাটি জমিয়া খাল প্রভৃতি ভরাট করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল কারণে গ্রাম বা নগরের জল নিকাশ হইতে না পারিলে ভূমি আর্দ্র থাকিয়া যায়। আর্দ্রভূমি ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রধান কারণ।

অনেকের বাটীর ভূমি বর্ষাকালে নিয়ত আর্দ্র থাকে। হয়ত বাটীর উঠান রাস্তা অপেক্ষা নিম্ন অথবা জল গড়াইবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত নহে, সুতরাং বৃষ্টির জল বহির্গত হইতে না পারিয়া উঠানে থাকিয়া যায়, তাহাতে বাটী কর্দ্দমময় হইয়া উঠে। অল্পকাল মধ্যে গোময়, মলমূত্র, আবর্জ্জনা প্রভৃতি জল ও কর্দ্দমের যোগে পচিয়া অতি ভয়ানক হইয়া উঠে।

গ্রামে অনেক পচা গর্ত্ত ও ডোবা থাকে, সেই গুলিতে জল সঞ্চিত হয়। গ্রামের আবর্জ্জনারাশি সচরাচর গৃহের সন্নিহিত গর্ত্তে ও খালি জমিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এ গুলি তাপ ও জল সংযোগে পচিয়া উঠে। তাহাতে অনিষ্টকর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ভূমি ও বায়ুকে দূষিত করে।

ভূমি, জল ও বায়ু দূষিত হইয়া জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বঙ্গ দেশের অনেক গ্রামে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, এবং গৃহস্থের বাটীর নিকটে বৃহৎ বৃহৎ বাগান ও পতিত জমি থাকিত, এই ভূমিতে লোকে মলমূত্রাদি ত্যাগ ও গৃহের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিত। এই সমস্ত পচিলে যে বিষময় পদার্থ উৎপাদিত হইত, সে গুলি বিস্তীর্ণ বায়ুরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়া যাইত, সুতরাং বিশেষ পীড়াদায়ক হইতে পারিত না। এক্ষণে অল্পস্থানে বহুসংখ্যক লোকের বাস; সকলেই সাধ্যমত গ্রামটী অপরিষ্কৃত করাতে দূষিত পদার্থরাশি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন

হইয়া অনিষ্ট করিতেছে। গ্রামসংস্করণের কয়েকটী নিয়ম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। সকলে মনোযোগী হইলে এই গুলিতে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

১। গ্রামের অভ্যন্তরে সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালনের উপায় রাখা আবশ্যক। উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে সরল ও প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিলে এবং স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত খালি জায়গা রাখিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। সচরাচর দেখা যায়, কোন জনাকীর্ণ পল্লীর ভিতর দিয়া প্রশস্ত নূতন রাস্তা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। রাজপথের দুই পার্শ্বে মনোহর তরুশ্রেণী রোপণ করা উচিত। রাস্তায় জল দিবার প্রণালী অনেক নগরে দৃষ্ট হয়। উহাতে ধূলা নিবারণ হয় এবং জল বাষ্পীভূত হইবার সময় ভূমি ও বায়ুর তাপ হরণ করিয়া বায়ু সুশীতল করে।

২। বৃহৎ বৃক্ষাদির যে সকল শাখা ভূমি হইতে ২০ ফুটের অনধিক উচ্চ, তাহা প্রতি বৎসর কাটিয়া না ফেলিলে বায়ু সঞ্চা-লনের ব্যাঘাত হয়। ক্ষুদ্র লতা গুল্ম, তৃণাদিও এরূপ পরিষ্কৃত রাখিবে যে, তাহাতে ভূমি জঙ্গলময় ও আর্দ্র না হয়। গ্রামের নিকটে কোন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি থাকিলে তাহার নিকটে এরূপ তরুশ্রেণী রোপণ করিবে যে, তত্রত্য দূষিত বায়ু বৃক্ষাদি অতিক্রম করিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে।

৩। গ্রামের নিকটে যদি অস্বাস্থ্যকর দলদলিয়া জলা থাকে, তাহা হইলে তাহার জল বহিষ্কৃত করিয়া ক্রমে তাহাতে কৃষি-কার্য্যের বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক।

৪। গ্রামের জল বহিষ্কৃত করিবার জন্য উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী রাখা আবশ্যক। প্রণালী আবশ্যক মত বৎসরে কয়েক বার

পরিষ্কার করিবে। সচরাচর নদীতীর হইতে ভূমি ক্রমে ঢালু হইয়া দূরবর্ত্তী বিলে পর্য্যবসিত হয়। পয়ঃপ্রণালী এরূপে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক যে, তাহার জল বিলের দিকে যাইতে পারে।

৫। অনেক গ্রামে বহুসংখ্যক ডোবা, পুষ্করিণী ও জলাশয় দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রায় একটীরও জল ব্যবহারযোগ্য নহে। কোথাও বা পুষ্করিণী ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে অতি অল্প কর্দ্দমময় জল আছে। স্থানান্তরে খাল, বিল বা পুষ্করিণীর জলে মনুষ্যপশ্বাদির মলমূত্র ও গলিত উদ্ভিজ্জাদি সংযুক্ত হইয়া উহাকে পানের অযোগ্য করিয়াছে। ডোবা ও পুষ্করিণীর মধ্যে কোন কোনটী গভীর করিয়া খনন করিবে এবং খনন কালে যে মৃত্তিকা উঠিবে তাহা দিয়া অপর গুলি পূরণ করিবে, কিন্তু পঙ্ক মাঠে পাঠাইয়া দিবে। তাহা হইলে দূষিত জলের বিনিময়ে সুস্বাদ পানীয় জল সংগৃহীত হইবে ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে। খাল কিংবা ক্ষুদ্র নদীর মুখ বন্ধ হইলে, উহার জল যাহাতে বহতা থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিবে, মৎস্য ধরিবার জন্য নদীতে বাঁশ, চাটাই প্রভৃতি দিয়া স্রোত রুদ্ধ করিতে দিবে না, এবং পান রন্ধন প্রভৃতির জন্য যে পুষ্করিণীর জল ব্যবহৃত হয় তাহাতে পাট শণ প্রভৃতি পচাইবে না। পানীয় জলের কূপ ও পুষ্করিণী এরূপে নির্ম্মাণ করিবে যে, সে গুলির জল কোন মতে দূষিত হইতে না পারে। বৃহৎ জলাশয় না থাকিলে সাধারণের জন্য ভাল ইঁদারা প্রস্তুত করা উচিত।

৬। কূয়া পায়খানা নির্ম্মাণ করিবে না এবং যে গুলি আছে, শুষ্ক মৃত্তিকা দিয়া পূরণ করিয়া ফেলিবে। মেতরের দ্বারা প্রত্যহ পায়খানার মল দূরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

৭। ভগ্ন ও পরিত্যক্ত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক। পরে

ঐ স্থান পরিষ্কার করিবে এবং উহা ঢালু করিয়া রাখিবে, তাহাতে জল নিকাশের সুবিধা হইবে। গ্রামের ভিতর কোন অপরিষ্কৃত স্থান থাকিলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা উঠাইয়া ফেলিবে এবং তাহার বিনিময়ে নূতন শুষ্ক মৃত্তিকা সন্নিবেশ করিবে।

৮। প্রত্যহ গৃহাদি ও রাস্তা সকলের আবর্জ্জনাদি গ্রামের বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুতিয়া ফেলা কিংবা নিক্ষেপ করা উচিত। গ্রামের পুরীষরাশি সেই স্থানে নীত ও প্রোথিত হইতে পারে। যে দিক হইতে সচরাচর বায়ু প্রবাহিত হয় না, গ্রামের সেই পার্শ্বেই এইরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। একখণ্ড ভূমি কিয়ৎকাল এইরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তখন আর একখণ্ড ভূমিতে ঐরূপ সার দিলে ভাল হয়। যে নদী বা পুষ্করিণীর জল পান করা যায়, তাহার নিকটে পুরীষাদি নিক্ষেপ করা অনুচিত।

৯। মাংস বিক্রেতাগণকে গ্রাম মধ্যে পশুহত্যা করিতে ও চর্ম্মকারদিগকে গ্রাম মধ্যে চর্ম্ম প্রস্তুত করিতে দিলে গ্রামের বায়ু দূষিত হয়। উহাদিগকে গ্রামের বাহিরে বাস করিতে দিবে এবং যাহাতে উহারা অস্থি ও নাড়ী প্রভৃতি পদার্থ ক্ষেত্রবিশেষে পুঁতিয়া ফেলে এরূপ বন্দোবস্ত করিবে।

১০। শবদাহ করিবার স্থান লোকালয় হইতে অন্ততঃ ৬০০ হাত দূরে রাখিবে। যে স্থানের জল ব্যবহার করা যায়, তাহার নিকটে শবদাহ করিবে না। নদীতীরে শবদাহ করিতে হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিবে। সাবধান, যেন শব আধপোড়া অবস্থায় জলে নিক্ষিপ্ত না হয়। জলে শব নিক্ষেপ করিলে মহা অনিষ্ট ঘটে। মৃত ব্যক্তির খাট, শয্যাবস্ত্র প্রভৃতি পুড়াইয়া ফেলিবে। উহা নদীতীরে ফেলিয়া রাখিলে সময়ে সময়ে অনিষ্ট

হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমাধিস্থান গ্রাম হইতে দূরে সংস্থাপিত করা উচিত। অন্ততঃ ভূমির ৬ ফুট নীচে শব প্রোথিত করিবে।

১১। প্রত্যেক গ্রামের নিকট পশুচারণের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণাবৃত্ত ভূমি রাখা আবশ্যক। এক্ষণে কৃষিকার্য্যের বিস্তারবশতঃ গোচারণের ভূমি কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং কাঁচা ঘাস অভাবে গবাদি ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে। তাহারা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দেয় না এবং বলিষ্ঠ বৎস প্রসব করে না। বাস্তবিক নানা কারণে এদেশের গবাদি ক্রমে নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে।

১২। গ্রাম বৃহৎ হইলে তাহার স্থানে স্থানে খালি জমি রাখা আবশ্যক। নদী, বিল বা পুষ্করিণী থাকিলে তৎসন্নিহিত ভূমির এরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করা উচিত যে, গ্রামস্থ অনেকে তথায় আসিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে। তৃণাবৃত ভূমিতে ফলপুষ্পাবনত তরুশ্রেণী থাকিলে উহা যেরূপ আনন্দদায়ক হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে উদ্যান সকল বিশ্রামের প্রকৃত স্থান। এক্ষণে অনেক গ্রামে বায়ু সেবনের উপায়াভাব হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের কত হানি হয়, তাহা বলা যায় না।

গ্রামসংস্করণের নিয়মাদি লিখিতে হইলে কলিকাতা মহা-নগরীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

কলিকাতায় উৎকৃষ্ট বিশোধিত বারি প্রায় গৃহে গৃহে ও দ্বারে দ্বারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতি গৃহের আবর্জ্জনারাশি দ্বার হইতে উঠাইয়া লইবার এবং নগর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে নিক্ষেপ করিবার বন্দোবস্ত আছে। এক্ষণে ভূমির অভ্যন্তর দিয়া যে ইষ্টক নির্ম্মিত

নর্দ্দামা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রতিগৃহের যোগ হইবার সুবিধা আছে। যোগ হইলে পায়খানা ও রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থানের ময়লা অদৃশ্যরূপে নর্দ্দামা দিয়া বহুদূরে চালিত হইয়া যায়। নর্দ্দামাতে গৃহের সর্ব্বপ্রকার জল পতিত হয়, তাহাতে নর্দ্দামা পরিষ্কৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। রাস্তার বড় নর্দ্দামায় অধিক ময়লা জমিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার উপায় আছে। ময়লা বৃহৎ নর্দ্দামায় উপস্থিত হইলে বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা দূরে চালিত হইয়া যায়। মৃত পশ্বাদি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, শবদাহের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে, এবং কসাই বা চর্ম্মকারের কার্য্য সহরের ভিতর হইতে পারে না। নগরের স্থানে স্থানে বায়ু সেবনের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার শোভা সম্পাদনার্থ বন্দোবস্তও আছে। প্রত্যহ রাস্তায় ঝাঁট দেওয়া হয়। রাস্তায় জল দিবার উপায় নির্দ্ধারিত থাকায় ভ্রমণকালে কষ্ট হয় না এবং বায়ুর শীতলতা সম্পাদিত হয়। সমস্ত রাত্রি রাস্তায় গ্যাসের আলোক থাকে, তাহাতে বদমাইস লোক সহজে ধরা পড়ে, অপরাপর লোকে অনায়াসে পথ দেখিয়া চলিতে পারে। কলিকাতায় এই সকল বন্দোবস্তের জন্য অনেক টাকা কর আদায় হয়। পল্লীগ্রামে লোকসংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং কর দিলেও এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বৃহৎ গ্রাম মাত্রেই উৎকৃষ্ট পানীয়জল সংগ্রহ করিবার উপায় থাকা উচিত। গ্রামের আবর্জ্জনারাশি ও পায়খানার ময়লা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য কোন বন্দোবস্ত করা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রচলিত আইন অনুসারে কোন প্রকার মিউনিসিপাল কর নির্দ্ধারণ করিয়া এই ব্যয়নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। গ্রামের লোক রাস্তার পার্শ্বে বা নদী ও পুষ্করিণীতে যাহাতে মলত্যাগ না করে, ইহা তদারকের

জন্য স্বতন্ত্র চৌকীদার নিযুক্ত করা আবশ্যক। কলিকাতার সন্নিহিত উপনগর প্রদেশের মিউনিসিপাল কমিশনরগণ উক্ত স্থানে কলিকাতা হইতে বিশোধিত জল লইবার এবং মৃত্তিকার নীচে দিয়া নর্দ্দামা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক বৎসর হইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। এক্ষণে ঐ উপনগরের অধিকাংশ স্থান কলিকাতার অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। উহার উন্নতি সাধন হইলে ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

রোগ নিবারণ।

এতদ্দেশে কয়েকটী পীড়া সময়ে সময়ে দেশব্যাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করে। ইহার মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা ও বসন্ত অতি ভয়ানক। যখন কোন গ্রাম বা নগরে ইহার কোনটী প্রাদুর্ভূত হয়, তৎকালে রোগীদের আর্ত্তনাদ ও তাহাদের পরিজনবর্গের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া কাহার চিত্ত না অস্থির হয়?

যে রোগত্রয়ের উল্লেখ করা গেল তদ্ব্যতীত হাম ও পানিবসন্ত সংক্রামক রূপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষ অত্যাচার না করিলে হাম ও পানিবসন্ত প্রাণনাশক হয় না। কিন্তু এই দুই রোগে জ্বর, উদরাময়, কাসি প্রভৃতি ক্লেশকর উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জ্বর। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, যশোহর,

বর্দ্ধমান, মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি নগর জ্বররোগের আবাসভূমি বলিয়া খ্যাত। এতদ্ভিন্ন যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কতিপয় জেলার অনেক গ্রাম জ্বরের উৎপাতে প্রপীড়িত হইয়াছে। এই রোগে প্রতি বর্ষে প্রায় দশ লক্ষ লোক বঙ্গদেশে গতাসু হয়। ১৮৮৭ অব্দের মৃতের সংখ্যা ১০,৮৭,৭৬৮। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের মৃতের সংখ্যা ১৬,০৭,৭১৬। পূর্ব্ব দশ বৎসরের গড়পড়তা ১০,২৭,৬৩৮।

যে ভীষণ জ্বররোগ বঙ্গদেশের অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে, তাহা সচরাচর ম্যালেরিয়া জ্বর নামে অভিহিত। ইটালীয় ভাষায় ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ মন্দ বায়ু। এক্ষণে এ শব্দটি এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া কি পদার্থ, উহাতে কিরূপে আমাদের রোগ জন্মে এবং কি উপায়ে উহার দমন হয়, তাহা সাধারণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

স্বাস্থ্যবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আর্দ্র ভূমি ভীষণ সূর্য্যাতপে শুষ্ক হইবার সময় ম্যালেরিয়া উৎপাদিত হয়। বর্ষাকালে বঙ্গদেশের নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলপূর্ণ এবং বিস্তীর্ণ ভূভাগ জলপ্লাবিত থাকে। শরদাগমে এগুলি শুকাইতে আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে।

ম্যালেরিয়া কি পদার্থ তাহা এপর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা ম্যালেরিয়া প্রদেশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া উহার প্রকৃতি স্থির করিতে পারেন নাই। অনুমান দ্বারাই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে স্থানবিশেষের বায়ুতে থাকিয়া রোগ ও যন্ত্রণা বিস্তার করে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে কাহারও বা ১০।১২ ঘণ্টায় কাহারও বা ৬।৭ দিনের মধ্যেই জ্বররোগ উৎপাদন করে। লোকে কখন কখন সহসা ইহাতে আক্রান্ত হয়। এই জ্বর দ্বিবিধ, সবিরাম ও অল্পবিরাম। যাহাকে এই জ্বর অতি প্রবলরূপে আক্রমণ করে, সে ২।১ দিনের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সচরাচর যে ভাবের ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায়, তাহাতে রোগী দীর্ঘকাল কষ্ট পায়, এবং যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, হৃদয়, মস্তিষ্ক প্রভৃতির দোষ জন্মে। এদেশে প্রথমতঃ প্লীহা বর্দ্ধিতহয়, এবং রোগী জ্বরান্তে কিছুদিন ভাল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হয়। প্রতিবারে প্লীহার আয়তন ও ভার বৃদ্ধি হয়, এবং কোন কোন ব্যক্তির যকৃৎযন্ত্রও সমকালে কিছুদিনের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে জ্বর একদিন বা দুইদিন পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে। এই জন্য উহাকে পালাজ্বর কহে। আক্রমণকালে কম্প, পরে গাত্রদাহ হয়, এবং অবশেষে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়।

সবিরাম বা কম্প বা পালাজ্বরের চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু যাহাদের অল্পবিরাম জ্বর হয়, তাহাদের রোগ প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী, এবং ভাল চিকিৎসা না হইলে তাহাদের আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা অধিক থাকে না। ঈদৃশ জ্বরের দিবারাত্র ভোগ হয়। জ্বর থাকিতে থাকিতে তাহার উপর জ্বর আইসে। ইহার প্রকৃত বিরাম কাল নাই। কেবল হ্রাস ও বৃদ্ধির কাল আছে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শরৎকাল হইতে এদেশে ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হয়। ঐ কালের প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ আর্দ্র ভূমির উপর পতিত হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে।

বাস্তবিক ভূমির আর্দ্রতা ও তাপাধিক্য সমকালে কার্য্যকারী না হইলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। গ্রীষ্মকালে তাপাধিক্য থাকে বটে, কিন্তু ভূমির আর্দ্রতার অভাব হয়, এজন্য ঐকালে জ্বরের আক্রমণ অতি বিরল। অর্ণবপোতবাসীরা অনেক সময় বৃষ্টি ভোগ এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র জলের উপরি বাস করে, কিন্তু তাহাতে উহাদের কম্পজ্বর হয় না। উহারা যখন সমুদ্র তীরের আর্দ্র ও উত্তপ্ত ভূমিতে উপনীত হয়, তৎকালে উহাদের জ্বর হইয়া থাকে।

এদেশের নিম্ন গলিতউদ্ভিদময় পললময় ভূমি ও ধান্যক্ষেত্র ম্যালেরিয়ার প্রকৃত আবাসভূমি। দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ও ব-দ্বীপ এবং বহ্বায়ত বিলের সন্নিহিত স্থানও ঐরূপ। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে জোয়ারের লোণা জল আইসে সেই প্রদেশের জলের কিনারা অতি ভয়ানক স্থান। এদেশের সুন্দরবন প্রদেশ ঐ কারণে এতকাল জনশূন্য রহিয়াছে। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া আছে তথায় উদ্ভিদগণ অতি সতেজ ও তথায় ভেক প্রভৃতি জীব-গণের সংখ্যা অধিক। সচরাচর গ্রীষ্মমণ্ডলের নিম্ন পললময় ভূমিতে ম্যালেরিয়া দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা স্পেন, ইংলণ্ড, হলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও আছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, কোন্ কোন পাহাড়ে চাথড়ি অধিক থাকায় তাহার ভিতর বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে; তাহাতে উদ্ভিদাদি পচিয়া দূষিত বাষ্প উৎপাদন করে।

ম্যালেরিয়া বায়ুর সহিত চালিত হয় এবং ক্ষুদ্র ঝটিকা হইলে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। দিবাভাগ অপেক্ষা প্রত্যূষে, সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিকালে, জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতা-বস্থায়, উন্নত স্থান অপেক্ষা নিম্নস্থানে উহা অধিক অনিষ্টকর—

হয়। কোন স্থান জলে আবৃত থাকিলে তথায় ম্যালেরিয়া দৃষ্ট হয় না। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, উহা নিবিড় গুল্ম ও তরুশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে নাই। ম্যালেরিয়া কোন প্রশস্ত নদীর উপর দিয়া এক পার হইতে অপর পারে আসিয়াছে, এরূপ কখন শুনা যায় না। নদী, পর্ব্বত ও বৃহৎ অট্টালিকা বা নগর ইহার গতিরোধ করে। শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য হইলে ইহার প্রভাব কমিয়া যায়। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি যে সকল নিম্নপ্রদেশের ভূমি বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, সে সকল স্থানে কোন বৎসর বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টি হইলে ভূমি দীর্ঘকাল জলে ডুবিয়া থাকে; শরৎকাল অতীত না হইলে তাহার জল কমিয়া যায় না, সুতরাং তখন শীতারম্ভ প্রযুক্ত ম্যালেরিয়া উঠিয়া প্রবল হইতে পারে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টি অধিক হইলে প্রায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যেহেতু ঐ সকল স্থান প্লাবিত না হইয়া অধিক আর্দ্র হয়। যে স্থানে অধিক সংখ্যক পাকা রাস্তা, পাকা ঘর ও পাকা উঠান আছে, সেখানে ভূমি দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত থাকাতে ম্যালেরিয়া অধিক উঠিতে পারে না।

যে স্থান আর্দ্র এবং জঙ্গলময়, তাহা পরিষ্কৃত করিবার কালে ম্যালেরিয়া উত্থিত হইয়া অনেকের পীড়া উৎপাদন করে। দেখা গিয়াছে যে, জঙ্গলের ভিতর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিবার কালে বহুসংখ্যক মজুর লোক জ্বরে আক্রান্ত হয়। কখন বা জলাভূমির সন্নিহিত তরুশ্রেণী কাটিয়া ফেলিলে দূষিত বায়ু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। পাকা ঘরের নেউ কাটিবার কালে কখন কখন দূষিত বায়ু উঠিয়া থাকে। কলিকাতায় যে সকল পুষ্করিণী গলিত পদার্থ দিয়া পূরণ করা হইয়াছে, তাহার

উপরের মৃত্তিকা উঠাইলে সময়ে সময়ে সন্নিহিত গৃহাদিতে জ্বরের আতিশয্য দেখা যায়। যে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, তথায় যাহারা একতালা ঘরে বাস করে, তাহাদের যত ব্যক্তির রোগ জন্মে, যাহারা দোতালা ঘরে থাকে, তাহাদের মধ্যে তত নহে।

যে স্থানের ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া পরিশেষে পর্ব্বত বা পাহাড়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যদি তত্রত্য সমভূমিতে ম্যালেরিয়া থাকে, তবে তাহা পর্ব্বতের উপর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া স্বীয় প্রকৃত প্রকাশ করে। পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশের নিম্নস্থান সর্চরাচর আর্দ্র ও জঙ্গলময়, তথায় উহার সমধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। পাহাড়িয়া প্রদেশের নিম্নভাগ ও নদীতীর স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। হিমালয়ের তরাই প্রদেশ ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য জন্য প্রসিদ্ধ।

কোন গ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হইলে তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তি উহাতে আক্রান্ত হন না। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী নহে। একক্রমে দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিলে কেহ কেহ তাহার জল বায়ুর দোষ কিয়ৎপরিমাণে সহ্য করিতে পারে, এজন্য গ্রামবাসী অপেক্ষা আগন্তুক ব্যক্তিরা উহাতে বেশী ক্লেশ পায়। এই কারণবশতঃই কোন কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে আসিয়া অল্পদিন পরে রোগাক্রান্ত হন, কিন্তু কিছুকাল এখানে থাকিয়া গেলে উহাতে আর তত কাতর হন না। নবাগত ব্যক্তিদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অনেক গ্রামের গর্ত্ত, ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতিতে পাট ও শণ পচান হয়, এগুলি পচিবার কালে জল ও বায়ু দূষিত করে। যেখানে নীলের কুঠী আছে, তথায় স্তূপাকার নীলের সিটী থাকিয়া পীড়াদায়ক হয়। একখানি জাহাজের খোলের ভিতর

করাতের গুঁড়া ও পাতলা চেলা কাষ্ঠ রাশীকৃত ছিল ; তাহা জলসংযোগে পচিয়া জাহাজের অনেকের জ্বর উৎপাদন করিয়াছিল। এই সকল উদাহরণ পাঠ করিয়া অনেকে মনে করেন যে, উদ্ভিদবিশেষ পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করে।

অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত এই যে, আর্দ্র ভূমির উপর প্রখর সূর্য্যাতপ পতিত হইয়া যে বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে, তাহাই সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। উক্ত কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এবং উহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুন্দররূপ জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহা যে কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়, তাহা বিলক্ষণ সম্ভবপর। ইহা জানা গিয়াছে যে যে প্রদেশের জল বহির্গত হইতে না পারাতে ভূমির আর্দ্রতা ও বায়ুর দোষ জন্মে, সেই সেই স্থানে খালের মুখ খুলিলে, নূতন নর্দ্দামা কাটিলে এবং জলাভূমির জল বাহির করিতে পারিলে স্থানটী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। বাস্তবিক অনেক স্থানে খাল ও নর্দ্দামা কাটিয়া জল বহিষ্কৃত করাতে প্রদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। কলিকাতা নগরের জল নিকাশের উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত হওয়াতে নগরবাসীদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৯ অব্দে জ্বররোগে যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার গড় সংখ্যা ৫,০৩০। পরবর্ত্তী চারি বৎসরের গড় ৩৬১৫ মাত্র অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রায় ১৪০০ লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বহরমপুর নগর পূর্ব্বে অতি অস্বাস্থ্যকর ছিল, কিন্তু উক্ত স্থানের জল বহিষ্কৃত করিবার জন্য গোবাটা নদী পর্য্যন্ত একটী সুগভীর নর্দ্দামা কাটাতে একণে ঐ নগর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। রঙ্গপুরেও ঐরূপ পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হওয়াতে উক্ত স্থান আর

পূর্ব্বের ন্যায় মর্ম্ম নাই। কোন কোন গণ্ডগ্রামে নর্দ্দামা কাটাতে অথবা জলনিকাশের উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করাতে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিলে অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভাব হ্রাস হয়, এই বিষয়টী বঙ্গদেশের সকলেরই বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত। কোন এক ব্যক্তির যত্নে বিশেষ কিছু উপকার হয় না বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া মনোযোগ করিলে অনেক পরিমাণে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কোন স্থানে ভালরূপে জল নিকাশ হইতেছে না, অথবা খাল বা ক্ষুদ্র নদীর মুখ রুদ্ধ হইয়াছে, কিংবা গ্রামে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী নাই, এই সকল বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর করিবার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ এই যে, এই সকল বিষয় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলে তাঁহাকে মনোযোগী হইতে হইবে। যদি দেশস্থ প্রজাবর্গ এই সকল কার্য্যে যত্ন ও আগ্রহ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনর ডাক্তার গ্রেগ সাহেব ১৮৯১ অব্দের বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছেন যে, জ্বর রোগ নিবারণের যে কয়েকটী উপায় আছে, তন্মধ্যে জলনিকাশের বন্দোবস্ত প্রধান। উৎকৃষ্ট পানীয় জল সংগ্রহ, গ্রামের আবর্জ্জনা ও ময়লা দূরীকরণ, নূতন পুষ্করিণী ও কূপ খনন প্রভৃতি উপায় দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ও জ্বর রোগের হ্রাস হইতে পারে।

কোন কোন গ্রামে অতিবৃষ্টির বৎসরে জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়। নর্দ্দামা ও নদী দিয়া অতিরিক্ত জলরাশি বহির্গত হইবার উপায় না থাকিলে এইরূপ ঘটে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে,

গ্রাম বিশেষে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির বৎসর জ্বরের বৃদ্ধি হয়। বেশী বৃষ্টিতে গ্রামের ময়লা ধৌত হইয়া যায়; অল্প বৃষ্টিতে উহা যথা স্থানে থাকিয়া পচিতে থাকে এবং অতি শীঘ্র জ্বররোগ উৎপাদন করে।

এদেশের অনেকে আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করে। খাট, তক্তা-পোষ বা মাচার উপর শয়ন করিলে উহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিতে পারে। একতালা ঘর অপেক্ষা উচ্চ দোতালা ঘরে শয়ন করিলে অনেক সময় কম্পজ্বর হইতে পারে না। গ্রামে পাকা রাস্তা, পাকা ঘর ও পাকা উঠান বেশী হইলে এবং গ্রামবৃদ্ধি পাইয়া মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ নগরে পরিণত হইলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব হ্রাস হয়। গ্রামের সন্নিহিত জলাভূমির নিকটে তরুশ্রেণী রোপণ করিলে তত্রত্য দূষিত বায়ু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পীড়াদায়ক হইতে পারে না।

এদেশের বৈদ্যেরা শরৎকালের প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ ও হেমন্ত-কালের শিশিরকে অতিশয় ভয়ানক মনে করেন। উহা ভোগ করিলে পীড়া জন্মে। বৈদ্যেরা ঐ কালে "চিরতার জল পান" করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাও দেখা গিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখেন, তাঁহারা অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা জ্বররোগে কম আক্রান্ত হন।

ওলাউঠা বা বিসূচিকা। মধ্যে মধ্যে এই ভয়ানক রোগ বঙ্গদেশের অনেক স্থান অধিকার করে। অনেক ইউরো-পীয় ডাক্তার অনুমান করেন যে, ওলাউঠা রোগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই অনুমানের প্রকৃত কারণ এই যে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে এই রোগ যশোহর প্রভৃতি স্থানে আরব্ধ হইয়া পরে বহুদূর ব্যাপ্ত হয় এবং তৎকালে

ইউরোপে উহার সংবাদ পৌঁছে। সে যাহা হউক এক্ষণে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই রোগ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বহুকাল হইতে ইউরোপে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যে বিসূচিকা রোগের বর্ণনা আছে, তাহা বর্ত্তমান কালের ওলাউঠার সদৃশ। বঙ্গদেশে এই রোগে ১৮৮৭ অব্দে ২,৭২,১৭৮ জন এবং ১৮৯২ অব্দে ২,৫৯,৬৯৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ব্ব দশ বৎসরের গড় পড়তা ১,৩৭,৯৪৮।

কিরূপে ওলাউঠা রোগ প্রথমে আবির্ভূত হইল, তাহা ঠিক করা যায় না। উদরাময় রোগে আহারের অত্যাচার ঘটিলে কখন কখন ওলাউঠার সদৃশ আকার ধারণ করে, কিন্তু উহাকে সচরাচর ওলাউঠা বলা হয় না। এপর্য্যন্ত যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তির ভেদবমির বিষাক্ত পদার্থ কোন মতে অন্য ব্যক্তির উদরস্থ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ রোগের বীজ বাহির হইতে উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

এদেশে কাহারও ওলাউঠা হইলে সচরাচর তাহার ভেদ বমনের পদার্থ শয্যাবস্ত্র ও বাসগৃহে পতিত হয়, ও উহার কিয়দংশ মৃৎপাত্রে করিয়া বাটীর উঠানে নিক্ষেপ করা হয়। পরে শয্যা-বস্ত্রাদি সন্নিহিত পুষ্করিণী, বিল, বাঁওড় বা নদীতে লইয়া গিয়া ধৌত করা হয়। যে ব্যক্তি বস্ত্রাদি ধৌত করে, সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হয়ত সেই জলাশয় হইতেই এক ঘড়া পানীয় জল লইয়া আইসে। পল্লীস্থ অন্যান্য লোকেও ঐ জল আনিয়া পান করে। জল, ওলাউঠার পদার্থ সংমিশ্রণে দূষিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মনে একবারও উদয় হয় না।

এদেশের গোয়ালারা অজ্ঞতাবশতঃ কখন কখন উক্তরূপ দূষিত

জলাশয়ের জল দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া তাহা বিক্রয় করে। ক্রেতাগণ যদি দুগ্ধ ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া পরে পান করেন, তাহা হইলে বিষের শক্তি নাশ হইতে পারে। কিন্তু যদি কাঁচা বা অল্প জ্বালের দূষিত দুগ্ধ কাহারও উদরস্থ হয়, তাহার এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সর্ব্বদা দুধ ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া খাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

একজন রোগীর বিছানা কোন পুষ্করিণীতে ধৌত করিবার পরে সেই পল্লীর ৩০ জনের ওলাউঠা হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্থানান্তরে দেখিয়াছি, যে জলাশয়ে রোগীর বিছানা ধৌত হইতেছে, তথা হইতে অনেকে পানীয় জল উঠাইতেছে ও সেই পল্লীতে ক্রমশঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

তীর্থ বিশেষে বা মেলার স্থানে বহু সংখ্যক লোক সমাগত হয়, তৎকালে কাহারও ওলাউঠা হইলে পানীয় জলের সহিত তাহার ভেদ বমনের বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া অনেক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। নদীর স্রোত অনুসারে ওলাউঠা রোগ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, নদীর জলে যে বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হয়, তাহা স্রোতে চালিত হইয়া ভিন্ন গ্রামের লোকের উদরস্থ হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

পানীয় ও খাদ্য সহকারে ওলাউঠার বীজ শরীরে প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে উক্ত বীজ মিশ্রিত জল, দুগ্ধ বা অন্যবিধ খাদ্য উদরস্থ না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। যে জলের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তাহা ভাল করিয়া ফুটাইবে এবং শীতল করিয়া পান করিবে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ফুটন্ত জলে ওলাউঠার বীজ নষ্ট হইয়া যায়। বাসন ও জলপাত্র প্রভৃতিতে ভেদ বমনের পদার্থ সংস্পর্শ হইলে সে গুলি উষ্ণ জলে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে রাখিবে।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে পুষ্করিণী ও কূপের জল সাবধানে সংরক্ষণ করিবে। কখন কখন রোগীর বাটীর লোক অনবধানতা বশতঃ জলপাত্রে রোগের বিষাক্ত পদার্থ লাগাইয়া ফেলে। সেই পাত্র পুষ্করিণী বা কূপের জলের সহিত সংলগ্ন হইলে সেই জলও দূষিত হয়। এরূপ স্থলে জলের অধিকারী স্বীয় ভৃত্যগণ দ্বারা নিজের ঘড়ায় করিয়া জল উঠাইয়া ঈদৃশ ব্যক্তিকে দিলে আর অপকার হইতে পারে না।

খাদ্য বা পানীয় সহকারে ওলাউঠার বীজ উদরস্থ হইয়া পীড়াদায়ক হয় বটে, কিন্তু উহা কখন কখন বায়ুতে মিশ্রিত থাকিয়া নিঃশ্বাসগ্রহণকালে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া রোগোৎপাদন করিয়াছে, ইংলণ্ডের কোন কোন ডাক্তার এরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, সাবধানে রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া কেহ উহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না।

ওলাউঠা রোগ কোন স্থানে আবির্ভূত হইলে যদি প্রথমতঃ অল্প সময়ে কতিপয় রোগী গতাসু হয়, তাহা হইলে অনেকের মনে সাতিশয় আশঙ্কা জন্মে, এবং উত্তরোত্তর রোগের বিস্তার হয়। কিয়দ্দিন পর রোগের আর তত তেজ থাকে না, ও উহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। রোগের প্রাদুর্ভাব কালে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১। বিশুদ্ধ জল পান ও বিশুদ্ধ জলে স্নানাদি করিবে। যে জলে ওলাউঠার বিষ মিশ্রিত হইয়াছে, কোন মতে তাহা ব্যবহার করিবে না।

২। ভেদবমির পদার্থ কোন ধাতু বা কাচ পাত্রে রাখিয়া অবিলম্বে তাহাতে কয়লাতের গুঁড়া বা গন্ধবিচালি মিশাইয়া

পোড়াইয়া ফেলিবে। সাবধান যেন উহা বাটীর উঠান বা গৃহের সন্নিহিত স্থানে বা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত না হয়।

৩। রোগীর বস্ত্রাদি পুষ্করিণী বা অন্য কোন জলাশয়ে ধৌত করিবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া কার্ব্বলিক আসিড্ বা কোন ঔষধের সহিত সিদ্ধ করার পর ধোপার বাড়ী পাঠাইবে।

৪। রোগীর মৃত্যু বা আরোগ্যের পর ঘরটী ভাল করিয়া ধৌত করিয়া পুনরায় চুণকাম করিবে।

৫। মুদী, ময়রা প্রভৃতির বাটীর কাহারও ওলাউঠা হইলে তাহার দোকান হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না। যদি দুগ্ধ ক্রয় করা হয় তাহা উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া ব্যবহার করিবে।

যৎকালে ওলাউঠা প্রাদুর্ভূত হয়, তখন ভেদ হইবামাত্র কোন ঔষধ খাওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট হইতে জেলায় জেলায় একপ্রকার বটিকা প্রেরিত হয়, গ্রামের ভদ্রলোকেরা উহা থানার পুলিসের দ্বারা পাইতে পারেন। কোন গ্রামে ওলাউঠা দেখিবামাত্র উক্ত ঔষধ জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আনা আবশ্যক। ঐ বটিকাগুলি ৪ গ্রেণ পরিমিত এবং আফিং, হিঙ্গ, গোলমরিচ ও কর্পূর এই চারি বস্তু সমান ভাগে মিশাইয়া উহা প্রস্তুত হয়। কোন কোন চিকিৎসক ১ গ্রেন আফিং ও ১ গ্রেন কেলামেল মিশ্রিত বটিকা ব্যবহার করেন। কেহ বা কর্পূরের আরক অথবা ক্লোরোডাইন্ প্রয়োগ করিয়া উপকার পান। কখন কখন দেখা যায় যে, ওলাউঠার প্রভাবকালে সামান্য জোলাপ লইয়া কেহ কেহ ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

বসন্ত। চীন ও ভারতবর্ষে এই ভয়ানক রোগ অতি দীর্ঘকাল হইতে প্রাদুর্ভূত আছে, কিন্তু উহা ইউরোপ ও আমে-

রিকাতেও বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই রোগ স্বভাবতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে হইলে অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করে এবং দেশব্যাপী হইয়া মহা অনিষ্ট করে। ইহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত এদেশে মনুষ্যশরীর হইতে বসন্তের বীজ গ্রহণ করিয়া টীকা দিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল; উহাতে যে কৃত্রিম বসন্ত হইত তাহা স্বাভাবিক বসন্ত অপেক্ষা অনেকাংশে মৃদুভাবে প্রকাশ পাইত, এবং তাহাতে ক্বচিৎ দুই এক জন মারা যাইত। এই প্রথা ইংলণ্ডে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়; পরে ১৭৯৮ অব্দে ডাক্তার জেনার গোবীজের টীকা দিবার পদ্ধতি প্রচার করেন। বোধ হয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে গোবীজের টীকা দিবার ফল কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে সমস্ত সভ্য-জাতির মধ্যে উক্ত পদ্ধতি বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ক্রমে রাজকীয় শাসন বা সাহায্য দ্বারা উহা প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। এখনও এদেশের অনেকের সংস্কার আছে, মনুষ্য-বীজের টীকা গোবীজের টীকা অপেক্ষা ফলপ্রদ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গদেশে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ৩৮৪৬ জন এবং ১৮৯২ অব্দে ১৩,৬৫১ জন এই রোগে মরে। পূর্ব্ব দশ বৎসরের গড় পড়তা ১১,১৫৬।

যে দুই প্রকার টীকা দিবার প্রথার উল্লেখ করা হইল, তাহার কোনটি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে যাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইত, তন্মধ্যে শতকরা ২৫।৩০ জন পঞ্চত্ব পাইত। ক্রমে যত বহুদর্শিতা লাভ হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতীতি জন্মিল যে, এই রোগ প্রায় কাহাকেও একবারের অধিক আক্রমণ করে না। তখন কৃত্রিম বসন্ত উৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হইল। মনুষ্য-বীজের টীকা দিবার পদ্ধতি এইরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিল। ইহাতে কত লোক উপকৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

ডাক্তার জেনার যৎকালে গোবীজের টীকা দিবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন, তখন অনেকে উহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে উহার উপকারিতা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। দেশীয় ও বিলাতী টীকার ফলাফলের প্রভেদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) রোগনিবারণ সম্বন্ধে দেশী ও বিলাতী টীকার গুণ প্রায় সমান। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যেটি লওয়া যাউক না কেন, লইবার পর অতি অল্প লোকে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়।

(২) যে টীকা গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে বিলাতী টীকা ভাল; কারণ উহা লইবার পর জ্বর প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ হয়, তাহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশী টীকা লইবার পর কেহ কেহ জ্বর ও উৎকট বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়।

(৩) সমাজের পক্ষে বিলাতী টীকা ভাল; কারণ উহা দেওয়া হইলে পর বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়া দেশব্যাপী হয় না। দেশী টীকাতে ঐরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) দেশী টীকা লইবার পর অনেকে অন্ধ, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ হয়, কেহ বা শরীরে স্ফোটক হওয়াতে ক্লেশ পায় এবং অনেকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকিয়া যায়। ইংরাজী টীকাতে কখন কখন সামান্য স্ফোটক মাত্র হয়, অন্যবিধ অনিষ্ট হয় না।

(৫) দেশীয় টীকা প্রদানের পর কয়েক দিন শিশুকে প্রত্যহ স্নান করাইতে হয়, পরে কয়েক দিন স্নান বন্ধ থাকে, বহুদিন পর্য্যন্ত পথ্যের পরিবর্ত্তন হয়, এবং শিশুকে অন্য শিশুদিগের সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়া হয় না। বাটীর কেহ মৎস্যাদি খাইতে, ক্ষৌরী হইতে, রজকগৃহে কাপড় দিতে ও ভিক্ষা দান করিতে পায় না। ইংরাজী টীকায় কেবল প্রথম দিন স্নান বন্ধ

থাকে, তৎপরে স্নানাহারাদির বিশেষ নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই।

বস্তুতঃ যাহাকে ভাল করিয়া ইংরাজী টীকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বসন্ত রোগের বড় ভয় নাই। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংরাজী টীকা দিবার পর বাঙ্গালা টীকা দিলে তাহাতে শরীরে বসন্ত বাহির হয় না এবং এই সকল ব্যক্তি বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচর্য্যা করিয়া প্রায়ই ঐ রোগে আক্রান্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে একাধিক বার কাহারও বসন্ত হয় না, কিন্তু এই সংস্কার অভ্রান্ত নহে। কেহ কেহ ২।৩।৪ বার এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যাহাদের দেশী টীকা হয় তন্মধ্যে অনেকেরও ঐ দশা ঘটিয়াছে। যাহাদের একবার মাত্র ইংরাজী টীকা হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এজন্য ডাক্তারেরা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, শৈশবকালে একবার ও যৌবনের প্রারম্ভে একবার ইংরাজী টীকা দেওয়া বিধেয়। যাহাদের ইচ্ছাবসন্ত হইয়াছে অথবা যাহারা দেশী টীকা গ্রহণ করিয়াছে, ইংরাজী টীকা গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষেও বিধেয়। যৎকালে বসন্ত রোগ দেশব্যাপী হয় তখন অনেকের পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রশস্ত। বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেকে টীকা লয় না, সুতরাং কলিকাতায় ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। ১৮৯৩ অব্দে মে মাসে ইংলণ্ডে রএল কলেজ অব্ সর্জনস সভা হইতে নিম্নলিখিত অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "আমাদের বিবেচনায় গোবীজটীকার জীবনরক্ষিণী শক্তির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে সতর্কতার সহিত টীকাদায়

করিলে বিপদের ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কখন কখন গোবীজটীকা সম্পূর্ণরূপে বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা না করিলেও উহাতে ঐ রোগের শক্তির হ্রাস করে, তাহাতে শুদ্ধ যে মৃতের সংখ্যা হ্রাস হয় এমত নহে, তদ্ব্যতীত অন্ধতা, শরীর বৈকল্য এবং অন্যান্য গুরুতর অনিষ্টেরও লাঘব হয়। এই কারণে গোবীজটীকা দিবার প্রথা এক্ষণে যেরূপ রাজাজ্ঞাদ্বারা প্রবল আছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন আমরা জাতীয় অমঙ্গল বলিয়া গণ্য করিব। ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দ্বিতীয় বার ঐ টীকা গ্রহণ আরও ফলোপধায়ক এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত।”

বসন্ত অতি সংক্রামক রোগ। এক ব্যক্তির এই রোগ হইলে তাহার শরীরনিঃসৃত পদার্থ কখন বা সাক্ষাত সম্বন্ধে, কখন বা বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া অন্য শরীরে লাগিয়া রোগ উৎপাদন করে। অনেক সময়ে মক্ষিকাদ্বারা রোগীর গাত্র হইতে বসন্তের বীজ দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইয়া অনিষ্ট করে। বাস্তবিক কখন কখন এক ব্যক্তির সংস্রবদোষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হয়। যদি কোন উপায়ে পীড়িত ব্যক্তির সহিত অন্যের সংস্রব হইতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় রোগ দেশব্যাপী হইতে পারে না। ত্রিবিধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে (১) প্রত্যেক ব্যক্তিকে গোবীজের টীকা দিয়া তাহাকে রোগের হাত হইতে রক্ষা করা। (২) রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ঈদৃশ নিভৃত স্থানে রাখা, যে পরিচারক ব্যতীত কাহারও সহিত তাহাদের সংস্রব হইতে না পারে ও রোগীর গৃহে অপ্রয়োজনীয় গৃহ-সামগ্রী না রাখা। (৩) যে সকল গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, খাট, তক্তাপোষ প্রভৃতি রোগীর ব্যবহারে লাগিয়াছে, অথবা যাহা রোগীর

শরীরনিঃসৃত পদার্থযোগে দূষিত হইয়াছে, সেই গুলির দোষ শোধন বা সেইগুলি পোড়াইয়া ফেলা।

যাহাদিগকে ২।৩ বার গোবীজের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদিগকে রোগীর পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিবে না। শয্যা বস্ত্রাদি পুড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়, নতুবা তাহা ফুটন্ত জলে দুইবার সিদ্ধ করিয়া পরে ধৌত করিবে এবং দীর্ঘকাল রৌদ্র ও বায়ুতে রাখিয়া দিবে। খাট, তক্তাপোষ ফুটন্ত জল দিয়া পুনঃ পুনঃ পরিষ্কৃত করিবে এবং দীর্ঘকাল রৌদ্রে ও বায়ুতে রাখিয়া দিবে। গৃহের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে গন্ধক জ্বালাইবে, তাহাতে গৃহ ও পর্য্যঙ্কাদি দোষবিহীন হইতে পারে। ঘরে কাঁচা কাঠ পুড়াইলেও কথঞ্চিৎ এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

গোবীজের টীকা রীতিমত প্রচলিত হইলে, বসন্ত রোগ একেকালে মনুষ্যসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবে কি না সে বিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কিন্তু উহাতে যে ঐ রোগের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, টীকার বীজের সহিত অন্যান্য রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করে।

পানিবসন্ত।—এই রোগ বসন্তের ন্যায় ভয়াবহ নহে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার আকারগত কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া লোকে ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করে। ইহার আবির্ভাবকালে জ্বর হয় এবং উহা গায়ে বাহির হইলে জ্বরের তাড়না কমিয়া যায়। এই রোগটী সংক্রামক। এক ব্যক্তির হইলে অন্যের হইয়া থাকে। সচরাচর শৈশব বা বাল্যাবস্থায় অনেকে ইহাতে আক্রান্ত হয়। এই রোগ হইলে ১০।১৫ দিন অন্যের সংস্রবে থাকা উচিত নহে।

হাম।—পানিবসন্ত অপেক্ষা হাম ক্লেশদায়ক। এই রোগ সংক্রামক এবং উহা যৎকালে দেশব্যাপী হয়, তখন ইউরোপ খণ্ডে অনেকে মারা যায়। একশত আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ৬।৭ জন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এদেশে মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ হামরোগে মরিয়া থাকে বটে কিন্তু শতকরা কতজন মরে তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

শৈশবকালে অনেকের হাম হইয়া থাকে, এবং প্রায় কেহ দ্বিতীয়বার উহাতে আক্রান্ত হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে বিশেষ ক্লেশ পায়।

কোন বাটীতে একটী শিশুর এই রোগ হইলে অপর গুলিও ইহাতে আক্রান্ত হয়। বাস্তবিক এই রোগে যে সকল পদার্থ রোগীর শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া বায়ুদ্বারা চালিত হয়, বা মক্ষিকাদি দ্বারা দূরে নীত হয় তাহা, যাহার পূর্ব্বে এই রোগ হয় নাই এরূপ ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করিতে পাইলে রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে অনেকের উদরের পীড়া, কাসি ও চক্ষুর প্রদাহ হয়। এইগুলি শীঘ্র আরাম হয় না। এজন্য রোগ হইলে তরল দ্রব্য উদরস্থ করিবে, উপযুক্ত গাত্রাবরণ ধারণ করিবে, এবং শয়নগৃহে অধিক রৌদ্র বা আলোক প্রবেশ করিতে দিবে না।

হাম হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয়। এই সময়ে ভুলক্রমে রোগীকে রেচক ঔষধ খাওয়াইলে উদরের পীড়া জন্মিয়া যায়, তাহাতে রোগী মহা বিপদে পড়িতে পারে।

যাহার হাম হয় তাহার বস্ত্রাদি ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া, দীর্ঘকাল রৌদ্র ও বায়ুতে রাখিবে। গৃহাদিও ভালরূপে পরিষ্কৃত করা আবশ্যক। সংক্রামক রোগ মাত্রেই গৃহে কার্ব্বলিক এসিড্ বা ফিনাইল ছড়াইয়া দিবে এবং গৃহের মধ্যে গন্ধক পোড়াইবে।

নবম অধ্যায়।

—:-*-:—

শারীরিক ও মানসিক শ্রম, নিদ্রা, বিশ্রাম ও মনোবৃত্তি।

শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম।—জগদীশ্বর আমাদের শরীর পরিশ্রমোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শরীরের যে অঙ্গ পরিমিতমত সঞ্চালিত হয়, তাহা সবল, পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়া উঠে; আবার যে অঙ্গ সেরূপ সঞ্চালিত না হয়, তাহা দুর্ব্বল. শীর্ণ ও শিথিল হইয়া পড়ে।

আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই পরিশ্রম লভ্য। যে অন্ন দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে আহরণ করিতে হইলে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। যে গৃহে বাস করিয়া আমরা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে কতই শ্রমের প্রয়োজন। আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি বিনাশ্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে লৌহময় মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া জনসমাজের অশেষ উন্নতির উপায় হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে কত যত্ন, পরিশ্রম ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন।

পরিমিত পরিশ্রম অশেষ সুখের আকর। যাহারা শ্রমবিমুখ তাহাদের কত প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শ্রম না করিলে আহার নিদ্রায়

প্রবৃত্তি হয় না, এবং বুদ্ধিশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়। ফলতঃ যাহারা নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তাহারা কিয়ৎকাল কোন কার্য্য বশতঃ গৃহে অবরুদ্ধ থাকিলে অথবা কার্য্য করিতে না পারিলে নিতান্ত অসুখী হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেক ভদ্রসন্তান শারীরিক পরিশ্রম করিতে অপমান বোধ করেন; ইহা কথনই পৌরুষের কার্য্য নহে। ইহারা শ্রমসাধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ, এজন্য ইহাদের অন্নাচ্ছাদন জুটিয়া উঠা ভার হইয়াছে। উহারা বৃথা জাত্যভিমান এবং বংশমর্য্যাদার অনুরোধে ক্রমশঃ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। অনেকে অন্যের গলগ্রহ হইয়া পড়ে, কেহ কেহ ভিক্ষোপজীবী হইয়া উঠে, তথাপি স্বীয় শ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহে না। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে অনেকে স্থূলকায় হয়, কিন্তু তাহাদের শরীরে যথোচিত সামর্থ্য থাকে না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অঙ্গ যত পরিচালিত হয়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই ক্ষতি পূরণ জন্য স্বভাবতঃ তদভিমুখে শীঘ্র রক্তের সঞ্চার হয়, তাহাতে সেই অঙ্গ পুষ্ট হইয়া থাকে। যে রক্ত দ্বারা শরীরের ক্ষতি নিবারণ হয়, তাহা ভুক্ত অন্ন হইতে উৎপন্ন; অতএব যাহারা অধিক পরিশ্রম করে, অলস ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরও বলিষ্ঠ হয়।

পরিশ্রম দ্বারা অঙ্গ বিশেষ যে সবল ও বর্দ্ধিত হয়, সচরাচর তাহার অনেক উদাহরণস্থল দেখা যায়। যানবহন করিয়া বেহারাদিগের স্কন্ধদেশ স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠে, নৌকা চালনদ্বারা মাজিমাল্লাদের হস্তাদির পেশী সকল সংবর্দ্ধিত হয়, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পদাতিক ডাকহরকরা বা পত্রবাহকেরা

সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের পদদেশের পেশী সকল বিলক্ষণ শক্ত ও স্থূল দেখা যায়। আবার যাহারা কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল ও শিথিল হইয়া যায়। তাহাদের অস্থি সমূহ এত কোমল যে, কোন প্রকার ভার বহন করিতে পারে না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কোন অঙ্গ চালনা করিবার ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা মস্তিষ্ক দ্বারা উক্ত অঙ্গের স্নায়ুতে বিজ্ঞাপিত হয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই স্নায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া সেই অঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই অঙ্গসঞ্চালনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব অঙ্গচালনা বিষয়ে ইচ্ছাই প্রধান। যেরূপ পরিশ্রম করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহাই অতি সহজে করা যাইতে পারে। অনিচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে গেলে মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না; সুতরাং স্নায়ু সকল প্রয়োজনমত কার্য্য করে না, তাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে অঙ্গ সকল ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রফুল্ল মনে পরিশ্রম করিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া কার্য্য করা যায়। বাস্তবিক আন্তরিক যত্ন থাকিলে লোকে কত পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কোন সময়ে উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া ৬ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। সচরাচর এরূপ শুনা যায় যে, অর্থলোভে কোন কোন দস্যুদল ১০।১১ ঘণ্টা মধ্যে পদব্রজে ৩০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়াছে।

৭। অভ্যাস পরিশ্রমের প্রধান সাধন। কোন কোন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রম করিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, কেহ বা তদপেক্ষা ১৫।১৬ বা ২০ গুণ শ্রম করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস

করিলে অধিক পরিশ্রম সহ্য হইয়া উঠে। বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও পরিশ্রম করিতে করিতে ক্রমে সবল হইয়া উঠে। কোন কোন রোগ কেবলমাত্র নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা দূরীকৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অনেক লোক ব্যবসায়ের অনুরোধে পরিশ্রম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু সকল ব্যবসায়ে সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন হয় না। বিশেষতঃ যাহারা ব্যবসায়ের অনুরোধে কেবল মানসিক শ্রমে রত তাহাদের শারীরিক পরিশ্রম করিবার বড় প্রয়োজন হয় না। এই সকল ব্যক্তিরা স্বতন্ত্ররূপে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ঈদৃশ পরিশ্রমকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়াম নানাবিধ। এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

নানাবিধ ব্যায়াম। ব্যায়ামের মধ্যে পদব্রজে ভ্রমণ অল্পায়াসসাধ্য। প্রত্যহ দেড় ক্রোশ বা দুই ক্রোশ বেড়ান উচিত। ২।৩ জন আত্মীয় একসঙ্গে বেড়াইলে মন প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং অধিক শ্রান্তিবোধ হয় না। বেড়াইবার সময় হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল স্থিরভাবে না রাখিয়া, কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইতস্ততঃ চালনা করা উচিত। অতি দ্রুতবেগে বেড়াইলে কোন কোন ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হয়। সবল ও সুস্থ শরীরেই দ্রুতগমন ক্লেশকর নহে। যতক্ষণ শ্রান্তিবোধ না হয়, ততক্ষণ হাঁটিয়া বেড়ান আবশ্যক। দৌড়িবার সময় রক্তের গতি অতি দ্রুত হয়। ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং অতিরিক্ত দৌড়িলে হৃদয় বা ফুসফুসের রোগ জন্মিতে পারে। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বা বয়োধিক ব্যক্তির পক্ষে দৌড়ান বা অশ্বারোহণ

সাঁতার দেওয়া অতিশয় অনিষ্টকর। কারণ ইহাদের হৃদয় সহজেই দুর্ব্বল।

ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইলে শরীরের অনেক অংশের সঞ্চালন হয়। উহাতে বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইয়া ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় সবল করে। অশ্বচালনায় পটুতা লাভ করিলে অন্যান্য উপকারও আছে।

এতদ্দেশের ও বিলাতের মল্লগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল ব্যায়াম করিলে শরীর বলিষ্ঠ হয় বটে, কিন্তু উহাতে সময় সময় শরীরের এত কষ্ট হয় যে, তাহাতে কখন কখন প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মল্লগণ দীর্ঘায়ুঃ হয় না, এবং অশ্বচালনা শিক্ষা কালে অনেক সৈনিকপুরুষ পীড়াগ্রস্ত হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় নানাবিধ সহজ সহজ ব্যায়াম অভ্যাস করা সকলেরই উচিত।

নৌকায় দাঁড় টানিলে বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় উত্তমরূপে সঞ্চালিত হয়। বন্ধুবর্গ একত্র হইয়া এরূপ করিলে আমোদের সহিত শারীরিক পরিশ্রম হয় বলিয়া, ক্লেশ বোধ হয় না। সন্তরণ শিক্ষা করা সকলেরই উচিত, উহাতে সময়ে সময়ে সহজে জীবন রক্ষা হয়। সন্তরণকালে হস্ত, পদ ও বক্ষঃস্থল বিলক্ষণ চালিত হয়। যে যে স্থানে নদী, বিল অথবা বড় দীঘি আছে, তথায় ঈদৃশ ব্যায়ামশিক্ষা অল্পায়াসসাধ্য।

বালকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভালবাসে। যে সকল ব্যায়ামে অনেক দৌড়িতে হয়, তাহার দোষগুণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কখন কখন দেশীয় প্রণালীতে ব্যায়াম করিতে গিয়া বালকেরা অসাবধান হইয়া উৎকট আঘাত প্রাপ্ত

হয়। এজন্য শিক্ষক অথবা অন্য কোন বিবেচক লোকের অসাক্ষাতে তাহাদিগকে ব্যায়াম করিতে দিবে না।

অল্প বয়স হইতে হস্তের পেশী গুলি সর্ব্বদা চালনা করা উচিত। কোন কঠিন দ্রব্যে পুনঃ পুনঃ মুষ্টি প্রহার করিলে এইটী অভ্যস্ত হয়। ইংরেজেরা উহাতে বিলক্ষণ পটু। হস্তদ্বয় বলিষ্ঠ হইলে অনেক সময়ে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। পদাঘাত শিক্ষা করিলেও উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

বন্দুকে গুলি চালনা ও তরবারিচালনা সময়ে সময়ে আত্ম-রক্ষার একমাত্র উপায়। যে যে প্রদেশে চুরী, ডাকাইতি ও রাহাজানীর ভয় আছে, অথবা যেখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে এই দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

একক্রমে একভাবে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে পীড়া হয়। অনেক বিদ্যালয়ে শিশু ছাত্রদিগকে ৪।৫ ঘণ্টা কাল একভাবে উপবিষ্ট রাখাতে, তাহাদের অঙ্গসকল উচিত মতে সঞ্চালিত হইতে পারে না; তাহাতে অনিষ্ট ঘটে। উহাদিগকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত, এবং সমুদায়ে ৩।৪ ঘণ্টার অধিককাল পাঠ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা অবিবেচনার কর্ম্ম। অধিকক্ষণ গৃহে আবদ্ধ বা একভাবে উপবিষ্ট রাখিলে, অঙ্গচালনা ও নির্ম্মলবায়ুর অভাবে শিশুগণ পীড়িত হইয়া পড়ে।

মানসিক শ্রম। শরীর রক্ষার জন্য যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক, বুদ্ধিশক্তি প্রখর করিবার নিমিত্ত সেই রূপ মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজনীয়। খাদ্য ও পরিধেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক বটে, কিন্তু কেবল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে মনুষ্য

ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম আলোচনা করিবার যে ক্ষমতা পাইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উপকরণ তাঁহার শরীরেই বর্ত্তমান আছে। মানবজাতির মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ উৎকৃষ্ট, অন্যান্য জন্তুর সেরূপ নহে।

মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব সাধিত হয়। যে সকল আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানবজাতি পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, তৎসমুদায়ই উহার দ্বারা সাধিত হয়। মনুষ্যের মানসিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, উহার বৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। যে মানসিক পরিশ্রম মনুষ্যের পক্ষে এত উপকারী, তাহা হইতে বিমুখ হওয়া সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

৩।৪ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিয়া এক ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করা উচিত। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিলে অনেকের পীড়া উপস্থিত হয়। রাজকর্ম্মচারী, চিকিৎসক, গ্রন্থকর্ত্তা, বিচারপতি, ব্যবহারোপজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিয়া স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। পাঠ্যাবস্থায় অনেকে রাত্রি জাগরণ করিয়া এবং প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অল্পকালের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও যশ লাভ করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, কিন্তু অভিলষিত ফল পাইবার পূর্ব্বেই পীড়িত হইয়া পড়েন। অথবা তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা এতদ্দেশীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ ঘটে।

প্রতিনিয়ত একপ্রকার মানসিক পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিলে

অন্যবিধ মানসিক শ্রম করিতে পারা যায় না। যাঁহারা কেবল গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন, তাঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির রসাস্বাদনে সক্ষম হন না। যাঁহারা কেবলমাত্র পুস্তক অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা পুস্তকলব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না, এবং হয়ত সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি আনন্দদায়ক শাস্ত্র অবহেলা করিয়া থাকেন। পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর আর শাস্ত্র, এই দুই শাস্ত্র শিক্ষার পথপ্রদর্শক মাত্র। অতি অল্পবয়স হইতে আমাদের পদার্থতত্ত্ব অবগত হইবার বাসনা জন্মে। মনুষ্য-শরীরের অসীম কৌশল শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে বস্তুবিচার, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যার আলোচনা করা উচিত। কোন্ কোন্ নিয়ম অনুসারে চলিলে শরীর সুস্থ থাকে, তাহার কতক গুলি অল্প বয়সে জানা আবশ্যক। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে বিজ্ঞান-ঘটিত অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। যে দেশে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা হয়, সেই দেশই অল্পদিনে সভ্যতার উচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের অবস্থা নিতান্ত হীন; প্রধানতঃ শব্দশিক্ষা এদেশে আজিও বিরাজমান রহিয়াছে।

মনোনিবেশ ব্যতিরেকে বিদ্যাশিক্ষা হয় না। যাহারা এক মনে পাঠের বিষয় চিন্তা না করে, তাহারা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না। পড়িবার কালে একবার এ পুস্তক, একবার ও পুস্তকখানি খুলিলে, কোনখানিতে মনোযোগ হয় না। শরীর যখন নিতান্ত ক্লান্ত থাকে, অথবা যৎকালে নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তখন পড়িতে গেলে পাঠ্যবিষয় বোধগম্য হয় না, শরীরও পীড়িত হইয়া পড়ে। অনিয়মে পুস্তক পাঠ করিলে অনেকের চক্ষু ও মস্তিষ্কের পীড়া জন্মে।

রাত্রিকালে আহার করিবার পরে পাঠ অভ্যাস করিয়া এদেশের অনেকে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এরূপ করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। অল্পবয়সে যশ পাওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তাহা পাইয়া চিরদিনের জন্য রোগভোগ করা আবার অধিক পরিমাণে ক্লেশকর। বিদ্যালয়ের কাল ব্যতীত বাটীতে ৫।৬ ঘণ্টা কাল একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিলেই চলিতে পারে। প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া, কিছুকাল বেড়াইবার পর দুই ঘণ্টা পড়িলে চলিতে পারে এবং বৈকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যার পরে দুই ঘণ্টা পড়িলে যথেষ্ট হয়। বার মাস এই নিয়ম পালন করিয়া পড়িলে, আর রাত্রিজাগরণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। যাহারা বৎসরের প্রথমে পাঠে উপেক্ষা করে, তাহাদিগকেই পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়।

নিদ্রা। নিয়ত পরিশ্রম করিলে, শারীরিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাদের বিশ্রামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে করিতে প্রথমতঃ শরীর অবসন্ন হয়, ইতস্ততঃ গমনাগমনে অনিচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া আসে এবং অবশেষে মনোবৃত্তি সকল নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন শ্রান্তিহারিণী নিদ্রা উপস্থিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হরণ করিয়া ফেলে। পরিশ্রান্ত ও শোকতাপাকুলিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নিদ্রা যেরূপ মহোপকারিণী তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ফলতঃ নিদ্রা না হইলে নানা রোগ এবং অচিরাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে, কোন দুষ্ট রাজা অপরাধী ব্যক্তিদিগের অনিদ্রারূপ দণ্ডবিধান করিত। উহাতে তাহারা এত ক্লেশিত হইত, যে, অনেক সময় আত্মহত্যা

করিতে উদ্যত হইত। সুনিদ্রার পর পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমজনিত ক্লেশ আর থাকে না।

রাত্রিকালই নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিবসে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে সন্ধ্যার পর নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। যাহারা শ্রমবিমুখ তাহারা কোন ক্রমেই সুনিদ্রারূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার এরূপ দুর্ভাগা যে, দিবাভাগ নিদ্রায় অতিপাত করে, এবং রাত্রিকালে নিতান্ত অস্থির হইয়া নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাকে আহ্বান করে; কিন্তু এরূপ লোকের কথনই সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই।

শরীর সুস্থ না থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। অসুস্থাবস্থায় নানা প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষ নিদ্রার বিশেষ প্রতিবন্ধক; এজন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গুরুতর ভোজন করা অন্যায়।

নিদ্রাকর্ষণ হইবামাত্র শয়ন করা আবশ্যক। যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, এবং মস্তিষ্ক উত্তেজিত না হয়, এরূপ আমোদ প্রমোদ করিলে সুনিদ্রা হইতে পারে। আত্মীয়গণের সহিত বাক্যালাপ, শিশুগণের আমোদ প্রমোদে উৎসাহদান, সুখপ্রদ পুস্তকাদি পাঠ ইত্যাদি উপায় দ্বারা এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে।

শয়নের পূর্ব্বে ক্রোধ, দ্বেষ, বিরক্তি প্রভৃতি ক্লেশকর ভাবের উদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য তৎসমুদয় পরিহার করা উচিত। কোন একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে শীঘ্র নিদ্রা হয়। অনেকে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হন; একাগ্রতাই তাহার কারণ। অন্ধকারে নিদ্রার সুবিধা হয়, এজন্য শয়নের পূর্ব্বে প্রদীপ নির্ব্বাণ করা আবশ্যক।

শয়নের পূর্ব্বে হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া, তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত; এবং বস্ত্রাদি যে পরিমাণে ব্যবহার করিলে শীত নিবারণ হয়, তাহাদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা বিধেয়। নিদ্রাকালে গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ নাসিকাদি আবৃত রাখা অন্যায়। এরূপ করিলে পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত দূষিত বাষ্প গ্রহণ করিতে হয়; তাহাতে পীড়া ও অকালমৃত্যু হইতে পারে।

পূর্ণ বয়স্কদিগের শয্যা নিতান্ত কঠিন বা কোমল হইলে, নানা-প্রকার দোষ ঘটে। শিশুদিগের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়া আবশ্যক। ভূমিতে শয়ন করিলে নানাবিধ রোগ হয়, খাট বা তক্তাপোষের উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিবে।

শয়নগৃহে বায়ু সঞ্চালনের বিশেষ উপায় রাখা উচিত; ছাদের নিকট দেয়ালের গায়ে পরস্পর ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখা আবশ্যক। কেহ কেহ রাত্রিকালের বায়ুকে এত ভয় করেন যে, তাহা যাহাতে কোন মতেই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এমন কি জানালা ও দ্বারের সন্ধিস্থানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলেও তাহা তুলা বা ছিন্নবস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এত সশঙ্ক হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ করিলে বায়ু গমনাগমনের পথ রোধ করা হয়, এই মাত্র। যেখানে শয়ন করা হয়, তাহার ঠিক সম্মুখের জানালা ও দ্বার খুলিয়া নিদ্রা গেলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে বাসগৃহের অন্য দিকের জানালা খুলিয়া রাখা উচিত, শীতকালে শীতনিবারণ জন্য কাজে কাজেই প্রায় সকল জানালা কপাট বন্ধ রাখিতে হয়। অনেকে এক গৃহে শয়ন করিলে বায়ু দূষিত হয়। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বিছানা করা আবশ্যক। এদেশে

শীতকালে ৭।৮ ঘণ্টা এবং গ্রীষ্মকালে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা গেলেই যথেষ্ট হয়। শিশু ও রোগীদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন।

বিশ্রাম। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করা আবশ্যক। বিশ্রামের অভাব বা অল্পতা হইলে শরীর ভগ্ন হয়। ব্যবসায়ের অনুরোধে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করে, অথবা যাহারা সহসা কোন আন্তরিক যাতনা পায় তাহাদিগের হৃদয় ও পাকযন্ত্র নিয়ামক স্নায়ুগণ সুন্দররূপে কার্য্য করিতে পারে না। প্রথমতঃ সচরাচর উহাদিগের হৃদয়ই রোগগ্রস্ত হয়। যে হতভাগ্য ব্যক্তি ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন তাহার মন নিরন্তর অসুখের আবাস এবং মৃত্যুই তাহার একমাত্র বন্ধু। কখন কখন ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি দ্রুতবেগে গমন করিতে গিয়া অথবা অশুভ সংবাদ পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ স্থলে হৃদয়ের কার্য্যরোধই মৃত্যুর কারণ। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলেও হৃদয়ের রোগ জন্মে। মন অতিরিক্ত চিন্তাপথে ধাবিত হইলে কখন কখন মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে। ঈদৃশ রোগের প্রারম্ভে রোগী সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকে, তাহার বুদ্ধিশক্তি প্রখর থাকে না, স্মরণশক্তিও দুর্ব্বল হয়, এবং সে ক্রমে ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মীয় লোকের বিরাগভাজন হইয়া উঠে। কখন কখন পক্ষাঘাত, মূর্চ্ছাবায়ু বা উন্মাদরোগ প্রবল হইয়া, এরূপ রোগীকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অতিরিক্ত চিন্তা ও মানসিক শ্রম করিলে অনেকে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়।

স্নায়ুযন্ত্রের অভিনব রোগ পরম্পরা উদ্ভূত হইবার নানা কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক রাজকর্ম্মচারী, চিকিৎসক, উকীল, সংবাদপত্রসম্পাদক, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি অর্থ বা খ্যাতির

লালসায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করেন; তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কোন কোন ব্যক্তি আবার প্রত্যহ রেলওয়ের সাহায্যে ২৫।৩০ মাইল দূর হইতে স্বীয় কার্য্যালয়ে আগমন করেন। এই সকল ব্যক্তি অতি প্রত্যূষে আহারাদি নির্ব্বাহ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া ষ্টেশন অভিমুখে অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হন, এবং আফিসে বা আদালতে উপস্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হন। অপরাহ্লেও উক্ত প্রকারে বাসস্থানে প্রত্যাগত হন। দীর্ঘকাল এরূপ যাতায়াত করিলে মনোবৃত্তি সকল নিয়ত উত্তেজিত থাকে। তাঁহারা কখনও আশঙ্কা করেন, হয়ত ট্রেণ পাইব না, কখনও আফিসে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া ভীত হন এবং প্রায় নিয়তই অন্যমনস্ক থাকেন। কেহ কেহ গাড়িতে উঠিবার পর ট্রেণ ছাড়িবামাত্র নিদ্রার বশীভূত হন, তাহাতেই তাঁহাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাস্তবিক এদেশের অনেকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে মানসিক শ্রম করিয়া স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দের মধ্যে যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ প্রচলিত আছে, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শরীর রক্ষার সম্ভাবনা। দেশীয় ব্যক্তিগণের আমোদ প্রমোদের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা অহোরাত্র কেবল স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। লোকেও তাঁহাদিগকে বিশ্রাম বা আমোদ করিতে সময় দেয় না। ঈদৃশ নিরানন্দ অবস্থায় আমাদের বড় লোকদিগের বাঁচিবার উপায় কি? কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের অনেক প্রধান ব্যক্তি বহুমূত্র বা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত

হইয়াছেন, অথবা ভগ্নদেহে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। যদি ইহারা নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতেন অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাতেই দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভূমির দুঃখ ও শোকের স্রোতের এত বৃদ্ধি হইত না।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, কিছুদিনের জন্য আফিস বন্ধ হইলে ইউরোপীয়েরা বিশ্রাম করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করেন। কখন বা দীর্ঘকালের অবকাশ লইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে দুই তিন সপ্তাহ থাকিয়াই অনেকের শরীর এত সুস্থ হয় যে, পুনরায় কিছুকাল কার্য্যক্ষম থাকে। বাঙ্গালীরা অবকাশ গ্রহণে উপেক্ষা করিয়া অল্পায়ু হইয়া পড়েন। বাস্তবিক যাহাদের রোগ বদ্ধমূল হয় নাই, তাহারা কখন কখন দুই তিন মাস বা বৎসরাবধি সুনিয়মে বিশ্রাম করিলে, সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। বিদেশ গমন করিতে হইলে, সাংসারিক বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কোন চিন্তার বিষয়ের সহিত সংস্রব রাখা উচিত নহে। সংস্রব রাখিলে মন ও দেহ শীঘ্র সুস্থ হইতে পারে না।

এদেশে তীর্থদর্শন প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যে সময়ে তীর্থ বিশেষে অধিক জনসমাগম হয়, তৎকালে তথায় ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। ঐ কালে তীর্থযাত্রা করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু অনেক তীর্থ স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত এবং তথায় নানাবিধ ঐতিহাসিক বা পারমার্থিক বিষয় অবগত হইয়া মানসিক শান্তি লাভ করা যায়। সুতরাং সময়বিশেষে তীর্থ যাত্রায় স্বাস্থ্যলাভ হয়। জলপথে ভ্রমণ ও সমুদ্র যাত্রাতেও বিশেষ উপকার হয়।

অনেকে মধুপুর, দেবগৃহ (দেওঘর), হাজারীবাগ, দার্জ্জিলিং,

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন, এরূপ দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে গমন করিলে অনেকের এদেশের ম্যালেরিয়া জ্বর অল্প দিনের মধ্যে দূরীভূত হইয়া যায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীর সবল হইয়া উঠে। কার্য্য হইতে অবকাশ গ্রহণ ও স্বাস্থ্যকর স্থানে সাবধানে বাস করিলে, লোকে দীর্ঘজীবী হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ৩। ৪ ঘণ্টা কাল বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও আমোদ প্রমোদ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহাতে অন্যূন ৬। ৭ ঘণ্টা সুনিদ্রা হয়, তাহার উপায় করা উচিত। মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন কর্ম্ম কাজ বন্ধ রাখিতে পারিলে আরও ভাল। পরিণতবয়স্ক কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রবিবারে বা ছুটীর দিনে কোন মতে পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নহে। যদি বাটীতে লোকে উৎপাত করে, তাহা হইলে আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়া উচিত।

মনোবৃত্তি। ক্রোধ, দ্বেষ, ভয় ও শোক যেরূপ স্বাস্থ্যের বিরোধী, অন্যান্য রিপু সেরূপ অনিষ্টকর নহে। ক্রোধের বশীভূত হইলে অতি শীঘ্র আয়ুঃক্ষয় হয়। সহসা ভয় পাইলে, কেহ কেহ অজ্ঞান হয়, কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকদিগকে কদাচ ভয় দেখান উচিত নহে। কোন কোন ব্যক্তি শোকাকুল হইলে কখন কখন উন্মাদব্যাধিগ্রস্ত হয়, কেহ বা ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ে।

সহসা এক সময়ে বিপরীত কার্য্যকারী রিপু সকল প্রবল হইলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়। রাজা দুর্য্যোধন, হর্ষ ও

বিষাদের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোন নির্ধন ব্যক্তি দুঃখের সময় সহসা ধনপ্রাপ্ত হইলে উন্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, কেহ বা আসন্ন মৃত্যুদণ্ড বা চিরনির্ব্বাসন হইতে রক্ষা পাইলে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়ে।

এদেশে কেহ কেহ শিশুদিগকে ভূত বা জুজু বা অন্যবিধ অজ্ঞাত পদার্থের নাম করিয়া ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতে মহা অনিষ্ট ঘটে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরাও শৈশবকালের সংস্কারের বশীভূত হইয়া, কখন কখন সহসা এরূপ ভয়াক্রান্ত হন যে, তাহাতে তাঁহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া উঠে। আমি দেখিয়াছি, এক যুবক সহসা ভূতের ভয় পাইয়া মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত হইয়াছিল। প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সেই রোগ বিদ্যমান ছিল।

এতদ্দেশীয় কোন বিচক্ষণ কবি লিখিয়াছেন, চিতা ও চিন্তা এই দুয়ের মধ্যে চিন্তাই প্রধান ; কারণ, চিতা নির্জ্জীবকে দাহন করে, চিন্তা সজীবের হন্তা। অন্যান্য চিন্তার ন্যায় জাতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনার চিন্তায় আয়ুঃক্ষয় হয় না।

দশম অধ্যায়।

বিবাহ।

সন্তান লালন পালন বিষয়ে, মনুষ্য ও পশুতে অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। পশুশাবক অল্পবয়সে জনকজননীর বশবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যসন্তান ২০। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম

পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ পিতামাতার মুখাপেক্ষ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক সন্তান পালন করা মনুষ্যের পক্ষে অতি কঠিন কার্য্য। সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে এই কার্য্যের কঠিনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সন্তানকে এরূপ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণসম্পন্ন করা আবশ্যক যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সাধনে তাহার ক্ষমতা জন্মিতে পারে। যে ব্যক্তির সন্তান রুগ্ন, মূর্খ ও দুরাচার, সে সমাজের নিকট বিশিষ্টরূপে অপরাধী।

রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যদি পিতা ও মাতা ক্ষয়কাস বা উন্মাদব্যাধিগ্রস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানদিগেরও ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পারিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বংশপরম্পরাগত রোগ আছে কি না দেখিয়া, পাত্র পাত্রী মনোনীত করিবে। স্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত থাকিলে যুবক যুবতীর পক্ষে ঈদৃশ নিয়ম রক্ষা করা কঠিন।

বাল্যবিবাহ। পিতামাতা সুশীল ও সুস্থকায় না হইলে সন্তান প্রায় ভাল হয় না। অতএব অসুস্থ মনে ও অসুস্থ শরীরে সন্তানোৎপাদন করা নিষিদ্ধ। স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক প্রগাঢ় প্রণয় না থাকিলে সন্তানের মনোবৃত্তি সকল উৎকৃষ্ট হয় না। অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে সচরাচর কন্যাদিগের সন্তান হওয়া উচিত নহে। ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিলে বিদ্যা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে, এবং ঐ কালের পর সবল সন্তান প্রসব করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে। এক্ষণে ১২।১৩ বৎসরে সন্তান প্রসব করিয়া বালিকারা অল্প বয়সে বৃদ্ধা হইয়া উঠে এবং অনেক সন্তান দৌর্ব্বল্য বশতঃ অল্প বয়সে কালকবলে পতিত হয়।

২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন পুরুষের বিবাহ করা উচিত নহে। বিবাহ না করিলেই যে কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইল এমন নহে। বিবাহের বিষয় চিন্তা করাও উচিত নহে। নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করাতে অল্পবয়সে অনেকের শরীর, মন ও জননেন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

এদেশে অনেকে বিবাহ করিয়া মানবজাতির দুঃখস্রোত বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। স্ত্রী পুত্র ভরণপোষণাভাবে ক্লেশ পায় ও অন্যের গলগ্রহ হয়। স্বাধীনভাবে পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, বিবাহ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। কেহ কেহ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া, সংসারের জ্বালায় অস্থির হন। কিছুকালের মধ্যে ইহাদের শরীর ও মন অসুস্থ হয় এবং ইহাদের পরলোক হইলে সন্তানাদি ভিক্ষোপজীবী হইয়া উঠে। কেহ বা বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিয়া নানাবিধ দুঃখে পড়েন।

এদেশে বাল্যবিবাহের নানাবিধ দোষ দৃষ্ট হয়। উহাতে অনেক বালকের লেখা পড়ার ব্যাঘাত হয়, এবং অল্প বয়সে ভোগাভিলাষ প্রবল হইয়া সাহসিকভাব উচ্ছেদ করে। অল্প বয়সে অন্নচিন্তা হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিশেষ হানি হয়।

একাদশ অধ্যায়।

জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ।

এদেশে জন্মমৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারণ জন্য যে সকল রাজনিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, সে গুলি কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সুন্দররূপে পালিত হইতেছে না। সুতরাং কোন প্রদেশের

জন্মমৃত্যুর তালিকা পরীক্ষা করিলে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। অনেক সময়ে ভ্রান্তিমূলক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় কারাগার সমূহে যে সকল ব্যক্তি রুদ্ধ থাকে, তাহাদের বয়ঃক্রম, পীড়া, মৃত্যু প্রভৃতি যথানিয়মে লিপিবদ্ধ থাকে। উহাদের সহস্র ব্যক্তির মধ্যে বৎসরে কত জনের কোন্ রোগে মৃত্যু হয়, তাহা সহজে জানা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের কারাগার যমালয় স্বরূপ ছিল। তথায় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম সমূহ উপেক্ষিত হইত এবং কারাগার এরূপ কুৎসিত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত যে, বহুলোক সমাগমে পীড়ার জন্মভূমি স্বরূপ প্রতীয়মান হইত। তাৎকালিক চিকিৎসা প্রণালীও অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ছিল। এই সকল কারণবশতঃ অনেক কয়েদী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত।

এক্ষণে জেলসমূহ যে পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক সুবিধা হইয়াছে। কয়েদীদিগের শরীর রক্ষার জন্য খাদ্য, পানীয়, পরিশ্রমাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। বাস্তবিক যে শ্রেণীস্থ লোকে সচরাচর কারারুদ্ধ হয়, তাহারা গৃহে বাস করিলে যে পরিমাণে সুস্থ থাকে, তদপেক্ষা কারাবাসে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে।

১৮৫৯ হইতে ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসর বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত জেলসমূহের কয়েদীদিগের মধ্যে প্রতি সহস্রে ৭৩ ব্যক্তি গতাসু হইত, ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা ৩৮ মাত্র দৃষ্ট হয়। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম পালনে অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যু সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে।

১৭[illegible] অব্দে লণ্ডন নগরে প্রতি সহস্রে ৪০ জন গতাসু হইত। ১৮০১ অব্দে ২৬ জন মাত্র; ১৮৪১ হইতে ১৮৫০ পর্য্যন্ত গড়ে ২৫

এবং ১৮৬১ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ২৪ মোট গতাসু হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান যত প্রচার হইয়াছে, লোকের অবস্থা যত উন্নত হইয়াছে, ততই মৃত্যু সংখ্যারও হ্রাস হইয়াছে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে সমস্ত ইংলণ্ডে প্রতি সহস্রে ২৫ জন গতাসু হইত। এক্ষণে ঐ সংখ্যা ২২ মাত্র। এই ফলটী এত সামান্য যে কোন মতেই বিশেষ আনন্দদায়ক বলা যায় না। কিন্তু মৃত্যু সংখ্যার কিছুমাত্র হ্রাসও জাতির বর্দ্ধনশীলতার পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই।

যে দেশে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এবং অল্প বয়সে গতাসু হয়, সে দেশের উন্নতির অধিক সম্ভাবনা নাই; জাত ও মৃত্যের সংখ্যা অল্প হইলেই দেশের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ফ্রান্স দেশের লোকে এই বিষয়ে সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সুখী হইয়াছে। আমাদের হতভাগ্য বঙ্গদেশে অকালমৃত্যু চিরবিরাজমান রহিয়া দুঃখস্রোতের বৃদ্ধি করিতেছে। যে অল্প বয়সে মরে, কেবল যে তাহার ভরণপোষণের ব্যয় নিষ্ফল হয় এরূপ নহে; তাহার রোগ ও মৃত্যুজনিত শোকে জনকজননী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এদেশে দশ বৎসর অন্তর যে জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ হয়, তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, উত্তরোত্তর বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বেশী নহে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শাস্ত্র অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কালের মধ্যে উহার উপদেশে স্থান বিশেষে মানবজাতির রোগ ও মৃত্যুর অনেক হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে উহার নিয়মাদি জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইলে, আরও উৎকৃষ্টতর ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার প্রশ্নসহ

আদর্শ প্রশ্নাবলী।

* "তারকা" চিহ্নিত প্রশ্নগুলি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন হইতে উদ্ধৃত।

*১। মূল পদার্থদিগের মধ্যে অধাতব পদার্থ কয়টী? কোন্ অধাতব পদার্থের সংযোগ বিয়োগে পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়? বায়ু, জল ও অপরাপর দ্রব্যে উহা কি কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে?

*২। বায়ুর উপাদান কি কি? সেই সকল পদার্থের প্রত্যেকের গুণ কি? ১০০০ ভাগ বায়ু মধ্যে উহাদের পরিমাণ কত?

৩। নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহা কোথায় যায় ও কি কার্য্য সাধন করে? অঙ্গারকাম্ল বায়ু কাহাকে বলে? কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়? এবং উহার উপযোগিতাই বা কি?

*৪। সপ্রমাণ কর যে, শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে বায়ু শরীরস্থ হয়, উহা দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া বহির্গত হয়।

*৫। শ্বাসরোধ হইলে মৃত্যু হয় কেন? বাহ্যবায়ু ও প্রশ্বসিত বায়ুর প্রকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য আছে কি না? যদি থাকে কারণসহ তাহার উল্লেখ কর।

*৬। মাংসপেশী, উপাস্থি, স্নায়ু, ত্বক্, ধমনী, কৈশিকা, শিরা, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয় ও শ্বাসযন্ত্র কাহাকে বলে এবং উহাদিগের কার্য্য কি?

*৭। ধমনীর রক্ত লাল ও শিরার রক্ত কাল কেন? শরীরের কোন্ স্থানে দূষিত রক্ত ধমনীর দ্বারা বাহিত ও বিশোধিত রক্ত শিরাপথে প্রবাহিত হয়?

৮। শীত কালে গাত্রদাহ ও ঘর্ম্ম হইলে রক্ত শীতল হয় কেন?

*৯। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক কি প্রকারে হয়? পরিপাক সময়ে পাকযন্ত্রের কোন্ কোন্ ভাগ হইতে কি কি রস নির্গত হইয়া থাকে? কোন্ রসে মাংসের পরিপাক সমাধা হয়? পরিপাক কার্য্যে কাহার সকলের

কোন্‌টির অভাবে কি কল হয়? মুখগহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত খাদ্য গমনের পথ অঙ্কিত করিয়া দাও।

*১০। ভুক্তদ্রব্য কিরূপে রক্তে পরিণত হয়? শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন রস নির্গত হয়, তৎসমুদয় কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

*১১। চাল, গম প্রভৃতি পরিপাক করিতে কোন কোন পাচক রসের প্রয়োজন? ভুক্ত দ্রব্যের সার ভাগ কিসে এবং অসার ভাগই বা কিসে পরিণত হয়?

১২। রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়া বর্ণনা কর; শরীরের রক্ত কোন প্রকারে দূষিত হইলে তাহা সংশোধনের উপায় আছে কি না?

১৩। শরীরের নিষ্প্রয়োজনীয় এবং দূষিত পদার্থ কি কি আকারে বহির্গত হইয়া থাকে?

*১৪। দুগ্ধকে আদর্শ খাদ্য বলে কেন? ১০০০ ভাগ মাতৃস্তন্যে কোন কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আছে? কোন কোন দ্রব্য কি পরিমাণে মিশাইলে মাতৃস্তন্যের অভাব অনেকাংশে নিবারণ করা যাইতে পারে?

*১৫। আহারের উদ্দেশ্য কি? আহার বিষয়ে কি কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিত? তৈলময় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কি?

*১৬। তাড়াতাড়ি আহার করা উচিত কি না? ইহাদ্বারা শরীরে কিরূপ ব্যাধি উৎপন্ন হয়? অতিভোজন জনিত অপকার কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে?

*১৭। অঙ্গারময় ও যবক্ষারজনকময় খাদ্য কাহাকে বলে? শরীর-পোষণ পক্ষে উহাদের প্রত্যেকের উপযোগিতা কি? কিরূপ অবস্থায় যবক্ষারজনকময় খাদ্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়? কতিপয় যবক্ষারজনকময় খাদ্যের নাম উল্লেখ কর।

১৮। ক্ষুধা উপস্থিত হইবার কারণ কি? কি কি কারণে ক্ষুধাকালের তারতম্য হয়? উৎকৃষ্ট খাদ্য কাহাকে বলে, এবং কেন?

*১৯। বাঙ্গালিদিগের আহারের দোষ কি কি? সামান্য লোকে দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজন না করিয়াও কেন বলবান থাকে?

*২০। প্রতিদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত সামগ্রী ভোজন করিলে শরীর কিরূপ থাকিবার সম্ভাবনা? হেতু প্রদর্শন করিয়া উত্তর লিখ।

*২১। সমান পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিয়া সকলে সমান পুষ্ট হইতে কি না? যুক্তির সহিত নিজ মত সমর্থন কর।

২২। অনেক বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তি অধিক আহার করে কেন? আহারের সময় পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ কেন? রন্ধনের উদ্দেশ্য কি?

২৩। অতিভোজন ও অপুষ্টিকর আহার গ্রহণ—এই দুইএর মধ্যে কোনটী দ্বারা কিরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে? এবং এদেশীয় লোকে কোন্ প্রকারের অনিষ্ট অধিক ভোগ করে?

পরিশিষ্ট।

বায়ু সঞ্চালন কাহাকে বলে? কি কি প্রাকৃতিক নিয়মে গৃহমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে? নির্ম্মল বায়ু সেবনের প্রয়োজন কি?

৪২। বায়ু পরিবর্ত্তনের উপকারিতা কি?

৪৩। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বহুলোক একত্রিত হইলে কি কারণে তাহা- প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা? এইরূপ লোকসমাকীর্ণ স্থানে কোন্ বাষ্পের চাব হয়? ঐ বাষ্প কোথা হইতে আইসে?

৪৪। ত্বক্ দ্বারা শরীরের আভ্যন্তরিক কোন কার্য্য সাধিত হয় কি না? র কার্য্যরোধ হইলে কি কি [illegible]ড়া হইতে পারে?

৪৫। ত্বকরোগের উৎপত্তি কিরূপে হয় এবং উহা নিবারণের প্রধান [illegible] কি কি?

৪৬। পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি কি উপকার হয়? মলিনবস্ত্র [illegible]ান ও অপরিষ্কৃত শয্যার শয়নের অনিষ্টকারিতাই বা কি?

৪৭। বাসগৃহ নির্ম্মাণ কালে যে কয়েকটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা [আব]শ্যক তাহা উল্লেখ কর। কি কি কারণে বাঙ্গালাদেশে দক্ষিণদ্বারী ও [illegible]র প্রদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারী ঘর উৎকৃষ্ট?

৪৮। কি রকম স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য? বায়ু ও রৌদ্র [illegible]মের জন্য কি কি উপায় করা উচিত? ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বিশুদ্ধ [বায়]ুর অভাব কি জন্য বেশী অনুভূত হয়?

৪৯। শয্যা, পরিধেয় বস্ত্র, বাসগৃহ, পানীয় জল ও আহার দ্রব্য কিরূপ [রা]খা উচিত? কারণসহ প্রত্যেকের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন কর।

৫০। গৃহের ভূমি শুষ্ক রাখিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন [করা] যাইতে পারে? নদীতে শব ও ময়লা নিক্ষেপ করিলে কি অনিষ্ট [হয়]?

৫১। গৃহের চতুষ্পার্শ্ব কি ভাবে রাখিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে?

৫২। গ্রাম সংস্করণের উদ্দেশ্য কি? এবং কি কি উপায়ে গ্রাম সংস্করণ [করা] যাইতে পারে? কারণসহ তাহার উল্লেখ কর।

৫৩। ম্যালেরিয়া কাহাকে বলে? উহা কিরূপে উৎপন্ন ও ব্যাপ্ত হয়? [উহা] দ্বারা মনুষ্য শরীরে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে? এবং উহার আক্রমণ [হই]তে নিস্তার পাইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

[৫৪। ম্যা]লেরিয়া জ্বর কি কি কারণে আরম্ভ ও কিরূপে উহা ব্যাপ্ত হয়।

[৫৫]। কি কি কারণে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়? উহা নিবারণের কি [নৈ]সর্গিক উপায় আছে?

৫৬। ওলাউঠার সময়ে কি কি নিয়ম পালন করিলে উহার আক্রমণ [হই]তে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে?

পরিশিষ্ট।

*৫৭। কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক গোবীজের টিকাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়? দেশী ও বিলাতী টিকার দোষগুণ বিচার কর।

৫৮। বসন্ত রোগ কি প্রকার? উহার সংক্রামকতা নিবারণ জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

*৫৯। ব্যায়ামের উদ্দেশ্য কি? কি কি রূপ ব্যায়াম স্বাস্থ্যকর ও অনায়াসে সাধিত হয় এবং কেন? প্রত্যহ যথোপযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন করিলে কি নিমিত্ত অনেক প্রকার রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়?

*৬০। মানসিক শ্রম কাহাকে বলে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা কি? এবং কি কি নিয়ম অবলম্বন করিয়া মানসিক শ্রম করা উচিত?

*৬১। লিখিবার ও পড়িবার সময় কিরূপ ভাবে বসা উচিত?

৬২। নিদ্রার উদ্দেশ্য ও প্রকৃত নিয়ম কি? পূর্ণবয়স্কদিগের অন্ততঃ কত ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত?

৬৩। বিশ্রামের প্রয়োজন কি? উহার অভাবে কি কি অনিষ্ট হয়? পরিশ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অবকাশগ্রহণ ও স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি?

৬৪। বাল্যবিবাহের দোষগুলি বর্ণন কর।

*৬৫। শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ কর।

*৬৬। জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টারির উপযোগিতা কি?

*৬৭। স্বদেশীয়দিগের মধ্যে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতক যে যে কদভ্যাস সর্ব্বদা দেখিতে পাও তাহার চারিটীর উল্লেখ কর।

*৬৮। মাথা শীতল এবং পা গরম রাখা উচিত। ঐ নিয়ম হিন্দুস্থানের লোকেরা প্রতিপালন করেন কি না?

৬৯। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান প্রধান উপায় সমস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব রচনা কর।